মোতাহের হোসেন চৌধুরীর
নির্বাচিত প্রবন্ধ

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ

সংকলন

আবুল কাসেম ফজলুল হক

ভূমিকা

শফিউল আলম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
আষাঢ় ১৪১৮ জুন ২০১১

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৬৭ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ইউসুফ হাসান

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0038-1

ভূমিকা

তিনি এক বিরলপ্রজ লেখক লোকচক্ষুর অন্তরালে, লজ্জাতুর; অথচ প্রবল ব্যক্তিত্বশালী, মিতবাক অথচ এক অপার্থিব সুন্দর ও সত্যের সাধনায় নিমগ্ন : খ্যাতির অভিলাষ তাঁর নেই; বিনয়ী, সজ্জন এবং সম্ভ্রান্ত মনের অধিকারসম্পন্ন হৃদয়বান পুরুষ তিনি, তিনি মোতাহের হোসেন চৌধুরী। সাতচল্লিশোত্তর ক্রান্তিকালে আমাদের সাহিত্যের আদর্শ, আঙ্গিক ও কলাগত ভাবনায় যখন আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্র চঞ্চল, বিবিধ বৈরী মতবাদ ও মতভেদের প্রচণ্ড ঝড়ে আন্দোলিত, তখনো এই নেহাত অধ্যাপক মানুষটি নীরবে আপন সাহিত্যকর্মে নিমগ্ন ছিলেন, মতবাদ ও মতভেদের বিভিন্ন ঝঞ্ঝাঘাত থেকে বহু দূরে। এবং সেজন্যই সম্ভবত কোনো দলীয় নামাবলি, 'মতবাদ' বা 'ইজম' তাঁর লেখাকে আক্রান্ত করে নি, বরং সর্বপ্রকারের মতাদর্শকে অশ্রদ্ধা না করেও তাঁর নিজস্ব ভুবনে, স্বকীয় শিল্পলোকে পরমহংসের মতো সন্তরণ করেছেন, আপন সৌরলোকে ঘুরেছেন, তাঁর বিশ্বাস ও চেতনালোক থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ে ও প্রগাঢ় প্রজ্ঞায় তাঁর বক্তব্যের বুনন দৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ ছিল।

বস্তুতপক্ষে মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যে যে ঐতিহ্যের প্রথম ও শক্তিশালী উন্মোচন, নজরুল ইসলামের গদ্য তাঁর পরিণত অগ্রগতিরই স্মারকবাহী। মীরের গদ্যের যে ভারী, ঋজু ক্লাসিকধর্মিতা বা নজরুলের গদ্যের যে প্রাণবন্যা—এর কোনোটারই প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি মোতাহের নন। তাঁর গদ্যে তাদের থেকে একটা ভাবগত এবং আঙ্গিকগত দূরত্ব সহজেই লক্ষণীয়। মীর মশাররফ যে সমাজগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, নজরুল ইসলামও সে সমাজেরই ছায়ায় লালিত। নজরুল যে-যুগের ধ্বজাবাহী, সে যুগ ক্রান্তি ও পরিবর্তনের এবং এ পরিবর্তনের অন্তরঙ্গ হাওয়ায় তাঁর গদ্য ও পদ্যাবলি উন্মীলিত। কিন্তু, যেহেতু প্রত্যেক সাহিত্যকর্ম ও শিল্পকর্ম যুগেরই প্রতিভাস, যন্ত্রণা আত্মদহনে রঞ্জিত, আনন্দ ও বেদনার স্মারক, সেজন্য নজরুলের রচনা চঞ্চল ও উর্মিমুখর না হয়ে পারে নি; যেহেতু সাতচল্লিশ-পূর্ব সময় স্বাভাবিক কারণেই ছিল উচ্ছ্বাস ও উদ্বেলতার যুগ, অস্থিরতার পদধ্বনি দিকে দিকে।

নজরুল যখন চারণের বেশে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; নতুন কথায়, প্রাণের বন্যায় ভরিয়ে দিচ্ছেন সারাদেশকে; নবীন চেতনার দ্বারা সনাতনপন্থীদের মনে ও হৃদয়ে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করছেন ঠিক সে সময়ে মুসলমান সমাজের একটি স্থিতধী তরুণ দল, বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়ে, অভীষ্ট পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মুসলমান সমাজের কুসংস্কার, অন্ধতা, বুদ্ধিহীনতা, কূপমণ্ডূকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদের উজ্জ্বল সূচিপত্র ছিল তাঁদের হাতে। অন্ধকারকে দূর করবার প্রদীপ্ত 'শিখা' ছিল তাঁদের হাতে। আর তাঁরা তাঁদের সম্মিলিত সংঘের নামকরণ করেছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'।

'শিখা' ছিল তাঁদেরই অন্তরের বহ্নিশিখার মুখপত্র। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য "চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগসাধন।" সংকীর্ণতা নয়, মূল্যবোধ ও যুক্তির বিচারে সবকিছুকে নিরিখ করাই এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তরুণ অধ্যাপক আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল ফজল, আনোয়ারুল কাদির এ আন্দোলনের প্রথম পথিকৃৎ হলেও এঁদেরই চিন্তাধারার মূলস্রোত ছিল মোতাহের হোসেন চৌধুরীর শোণিতে। এবং সত্যিকার অর্থে তিনিই ছিলেন "খুব সম্ভব বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের শেষ ফসল।" বুদ্ধির মুক্তি যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উঠতি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, এবং অনেকে পেশাগত কারণে বা বৃত্তিগত প্রেরণায় লেখাকে একটা অন্তর্গত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক জীবন ও জগতের পরিবর্তন ও নবমূল্যবোধের চৈতন্য তাঁদের নতুন করে ভাববার প্রেরণা যুগিয়েছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মুখপত্র 'শিখা' ও প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' মোতাহের হোসেনকে যুগপৎ আকর্ষণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বাইরের দিক থেকে 'শিখা'য় সমাজসচেতনতা প্রবলভাবে উচ্চারিত হলেও আন্তরিক ভুবনে তার মধ্যে ছিল ব্যক্তির জড়তা উন্মোচনের আগ্রহ এবং এদেশের তরুণ মুসলমান সম্প্রদায়কে আত্মসম্মানবোধে জাগ্রত ও উদ্দীপিত করে তোলবার ঐকান্তিকতা। অপরপক্ষে 'সবুজপত্রে'র আদর্শ ছিল সতেজ ও জাগ্রত মননের উদ্বোধন ঘটানো। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মানসভূমি এ দুটি কেন্দ্র থেকেই সমানভাবে প্রেরণা পেয়েছিল। কোনো প্রকারের ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, এজন্যেই তাঁর রচনায় দুর্লভ। বরং সবসময় এক বুদ্ধিনিষ্ঠ বিবেচক হৃদয়বান সংযমী শিল্পীর দৃষ্টি দেখা যায় তাঁর প্রতিটি রচনায়। একদিকে কাজী আবদুল ওদুদ অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী দু'জনেই তাঁর হৃদয়ের কাছাকাছি। যুক্তি বিচার ও মূল্যবোধ তাঁর সমস্ত চিন্তার স্রোতকে এক সুনির্দিষ্ট সুগ্রথিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে গেছে ; সে কারণেই তাঁর প্রবন্ধে বক্তব্য যেখানে সোচ্চার হয়েছে আপন নিজস্বতায়, যুক্তির ভারসাম্যেও সেখানে তা হয়েছে ঋদ্ধ। আনন্দ, সুন্দর, প্রেমবোধ, কল্যাণবোধ তাঁর রচনার ও চিন্তার আকর। মোতাহের হোসেন যে যুগ ও পরিবেশের সন্তান তা প্রধানত ছিল নব্যচিন্তায় উদ্দীপ্ত মুসলমান যুবকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের যুগ। মোতাহেরের রচনায় এ কারণেই নতুন ব্যক্তিবাদ, একক সৌন্দর্যবিশ্বাস ও আনন্দচর্চার ধ্বনি শোনা যায় অবিরামভাবে। তাঁর সাহিত্যচর্চার পটভূমিতে যদিও রয়েছে এক সুসংস্কৃত ব্যক্তিমানস, তথাপি সাহিত্যচর্চাকে তিনি বুদ্ধির মুক্তির অন্য প্রবক্তাদের মতো কোনো মন্ত্র বা হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যচর্চা তাঁর কাছে ছিল গভীর শ্রদ্ধায় ভরা পবিত্রতায় পূর্ণ নৈবেদ্যের মতো। তিনি বলেন : "লেখা আমার কাছে একপ্রকারের প্রার্থনা আর প্রার্থনার উদ্দেশ্য আত্মার ঔজ্জ্বল্য সাধন, অর্থ উপার্জন নয়।" শুধু তাই নয়, এমন এক নির্মল ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী তিনি ছিলেন যে, সাহিত্যচর্চায় কোনোপ্রকার প্রতিযোগিতা করাকে তিনি পাপ বলে মনে করতেন। সবকিছুর উর্ধ্বে তিনি চেয়েছেন একজন সংস্কৃতিবান, যুক্তিনিষ্ঠ, প্রেমময় ও সভ্য মানুষ হতে। তাঁর এ চিন্তার জগতে আরো দুজন মনীষী তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছেন। এবং প্রকৃতপক্ষে "বহু বিভিন্ন দিগন্ত থেকে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ওপর আলো এসে পড়েছিল ; যদিও শেষপর্যন্ত যে-কোনো সৎ লেখকের মতোই তাঁর নিজস্ব কিছু ছিল, যার জন্য তাঁকে চেনা যায়। তাঁর ওপরে যেমন দেশজ

কোনো কোনো ব্যক্তির প্রভাব দেখি, তেমনি তিনি কোনো কোনো মহৎ বৈদেশিকের অংশভাগী।" এ বৈদেশিক দুজন হলেন বিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদী দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল ও চিন্তাবিদ ক্লাইভ বেল। "ক্লাইভ বেল এবং বার্ট্রান্ড রাসেল মেঘের মতোন ছায়া ফেলে আছেন তাঁর ভাবনার আকাশে।" ক্লাইভ বেল বা রাসেল যে যুগ-সমাজের প্রতিনিধি, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর যুগ ও সমাজ তা থেকে ভিন্ন হলেও চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন তাঁদের সঙ্গে একাত্ম। তাঁদের মতোই মানবতার শুভবুদ্ধি ও নিরঞ্জন সুন্দরের সাধনা তাঁরও কাম্য এবং তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মে এর পরিচয় বিস্তৃত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং বিংশ শতাব্দীর উদার মানবিকতাবাদের জয়ধ্বনি—এই দুই দিগন্ত সমানভাবে তাঁর রচনার ওপর আলোক ছড়িয়েছে। রাসেল স্বকীয় উদারতায় ও মানবিকতাবাদে যেমন একদিকে মানবসমাজের অন্যতম প্রতিভূ, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ব্যক্তিচিন্তার দ্বন্দ্বে প্রায়শ জর্জরিত, দীর্ণ এবং হতাশাগ্রস্ত। একটা বিরাট আত্মদ্বন্দ্বের ছায়া লক্ষ করা যায় তাঁর সমগ্র জীবনে। ক্লাইভ বেলের (যিনি 'সভ্যতার' আলোকে জীবনের মূল্যায়নের প্রয়াসী) রচনায়ও এক প্রচণ্ড আত্ম-অভিঘাত বর্তমান এবং প্রায়শ আত্মদ্বন্দ্বে নিক্ষিপ্ত তিনি। যেহেতু এঁরা দুজনেই ঊনবিংশ শতাব্দীর চেতনার পটভূমিতে এবং বিংশ শতাব্দীর মানবিক মূল্যবোধে লালিত, সুতরাং এঁদের চৈতন্যে এই সংঘাত স্বাভাবিক। তাছাড়া মহৎ শিল্পীমাত্রেই তো আজীবন এই অবধারিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিকার। মোতাহের হোসেন যেহেতু এঁদের দুজনেরই ভাবশিষ্য, তাঁর রচনায় তাই বেল ও রাসেলের কণ্ঠ অনুচ্চ নয়।

শুধু জীবনধারণ করাটাই বাঁচা নয়। বাঁচাটাও একটা শিল্পিত জীবনধারা। জীবনের সৌন্দর্য, রসপিপাসা ও অর্থময় ভাবজগৎকে স্বকীয় জগতে জারিত করে নেয়ার মধ্যেই জীবনের মহত্তম সার্থকতা ও গভীরতম তাৎপর্য। প্রয়োজন দিয়েই শুধু মানুষ বাঁচাকে পরিপূর্ণতায় উত্তীর্ণ করতে পারে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক বাচ্যাতিরিক্ত অব্যক্ত আনন্দময়তার সন্ধান মানুষকে করতে হয়। তাঁর মতে : আমরা জীবনে বাঁচার উপায়কেই বড় করে দেখি; জীবন আমাদের কাছে তাই অর্থ উপার্জনের একটা নিমিত্ত মাত্র। জীবনকে আমরা সর্বদা বেড়া-দেয়া শস্যক্ষেতের মতো সযত্নে লালিত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করি। আর সেই অতি-যত্ন এবং অতি-সাবধানতার ফলেই আমাদের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমরা জীবনে কৃতকার্যতা লাভ করি না বলে আমাদের হতাশা ও দুঃখের শেষ নেই। মোতাহের হোসেনের ভাষায়—"জীবনের উদ্দেশ্য জীবন উপভোগ; কৃতকার্যতা নয়, কৃতকার্যতা একটা উপায় মাত্র।" তিনি আরো বলেন, "বাঁচার উপায়কে যখন বড় করে তুলি জীবন তখনই হয় দরিদ্র, বাঁচার উদ্দেশ্যকে বড় করে তুললেই জীবন ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে।"

তাঁর কাছে জীবন যেহেতু এক সুন্দর আনন্দলোকের সঙ্গে মিশ্রিত, তাই তা কখনো অসংস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন নয়। তিনি তাই বারংবার তথাকথিত ধার্মিক হওয়ার চাইতে সংস্কৃতিবান হওয়ার প্রার্থনা করেছেন। এবং যা জীবনপ্রদ, তাকেই সুখের উৎস মনে করেছেন : "যা জীবন-দায়ী তাই সুখ-দায়ী। কালচারের উদ্দেশ্য তাই সুখ সাধনা।" আর কালচার তাঁর দৃষ্টিতে তথাকথিত কোনো সংঘবদ্ধ জীবনাচরণ নয়, বরং "কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা—সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি।" এবং

"সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়, উপায়। উদ্দেশ্য নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লা সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে সেই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়।"

তাঁর জীবনচেতনা বরাবরই এককেন্দ্রিক এবং নিজস্ব বলয়ে ঘূর্ণিত এবং সে বলয়ে শুধু সুন্দর আর আনন্দের, কল্যাণ আর প্রেমেরই ধ্বনি। তাই সংস্কৃতি বলতে তিনি মনে করেন—"সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা, প্রকৃতি-সংসার ও মানব সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা .... নদীর হাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায় বাঁচা আকাশের নীলিমায় তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা, বিরহীর নয়নজলে মহতের জীবনদানে বাঁচা...। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।" মনে হয় মোতাহের হোসেনই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কণ্ঠ যিনি জীবনকে, বাঁচাকে এবং শিল্পিতভাবে বাঁচাকে সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করেছেন।

মোতাহের হোসেনের চেতনায় সংস্কৃতি চিন্তা ছাড়া অন্য যেসব বিষয় আলোড়ন ও আন্দোলন এনেছে তা হল তাঁর 'সভ্যতা' সম্পর্কিত চিন্তা এবং জীবনের চত্বরে মূল্যবোধ ও যুক্তি-বিচারের প্রতিষ্ঠা। সভ্যতা তাঁর দৃষ্টিতে "আলোক ও মাধুর্যের সাধনা।" তাঁর সভ্যতাবিষয়ক চিন্তায় ক্লাইভ বেল প্রধান অনুপ্রেরণা। তাঁর 'সভ্যতা' গ্রন্থটি তিনি অনুবাদও করেছেন। তবে সেটাকে শুধুমাত্র অনুবাদকর্ম বললে ভুল হবে। মূল সৃষ্টির মতোই এই রচনাটি তাঁর আপন বক্তব্যে পূর্ণতর। বইটির রচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "অহং আশ্রিত মোহ থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ সহজভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতার পানে তাকাতে সক্ষম হবে, এই ভরসাতেই আমি বেল সাহেবের অনুসরণে এই বইখানি লেখার প্রেরণা অনুভব করি।" তিনি তাই সর্বদা 'ইতর সুখের চেয়ে সূক্ষ্ম সুখকে' বড় করে দেখেছেন এবং সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও প্রেমবোধকেই সভ্যতার মাপকাঠি বলে গ্রহণ করেছেন।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী আজীবন জন-কোলাহলের বাইরে নিয়োজিত ছিলেন, আপন হৃদয়লোকের সৌন্দর্যে সৃষ্টির এক কল্পিত সুখলোকের স্বপ্নসাধনায়। এর ফলে যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জীবদ্দশায় তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধরাজি স্বকীয় ঐশ্বর্য নিয়ে অলক্ষ্যেই প্রায় ঝরে গেছে, কখনো কখনো সৌন্দর্যসন্ধানী প্রেমিকদের হাতে এলেও এবং তার সুবাস বিভিন্নজনের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও তা নিয়ে পাঠকসমাজে ব্যাপক কৌতূহল কখনো দেখা যায় নি। তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, অনেকটা আকস্মিকভাবেই আমাদের সাহিত্যের পদপাতবিরল অঙ্গনে এক নতুন ও অনাবিষ্কৃত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়ে যান সুধীসমাজ। সনিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃতিবান একজন লেখক যেন আবিষ্কৃত হন আমাদের সাহিত্যে। তাঁর চিন্তার বহুমুখী ধারা এ গ্রন্থেও লক্ষ্যযোগ্য—সংস্কৃতি, জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব, রিনেসাঁস, দুঃখবাদ এবংবিধ বহুবিষয় আলোচ্য হয়েছে এই গ্রন্থে। তবে তাঁর সমস্ত লেখা ও চিন্তার বিশ্লেষণ করে মোটামুটি এ উপসংহারে আসা যায়—'কোনো গোঁড়ামি নয়, একদেশদর্শিতা নয়, তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা নয়, এক সুচারু ও ভারসাম্যময় মধ্যপথ তাঁর অবলম্বন—এটা অবশ্য ভীরুর গন্তব্য নয়, বরং শক্তি ও সুন্দরের, সাহস ও রুচির সহ অবস্থান।" তাঁর সম্পর্কে

এ মন্তব্য যথার্থ : "তিনি অমিতাচারের বিরোধী, আবেগবান তিনি, কিন্তু আবেগ উত্তাল নন; যুক্তি বিশ্বাসী কিন্তু হৃদয়কে উপেক্ষা করে নয় ; তিনি বক্তব্যে দৃঢ় কিন্তু গোঁড়া নন, কৌতুক ভালোবাসেন কিন্তু ব্যঙ্গপ্রবণ নন। এই ব্যক্তিত্ব বিরল।"

মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'সভ্যতা' গ্রন্থটির অনুবাদ ছাড়াও বার্ট্রান্ড রাসেলের 'দি কংকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস' গ্রন্থটির মূলানুসরণে 'সুখ' গ্রন্থটি রচনা করেন। বহুলাংশে এই গ্রন্থ মূল বইটির অনুবাদ হলেও বেলের অনুসরণে 'সভ্যতার' রচনার মতো এখানেও তিনি নিজের মতামত সুন্দরভাবে গ্রথিত করেছেন। অনুবাদগ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাঁর অনিন্দ্য রুচি ও জীবনবোধের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি বেছে বেছে সেসব বইকেই অনুবাদের জন্য গ্রহণ করেছেন যেগুলো তাঁর চিন্তা ও রচনায় উজ্জ্বল রশ্মি ফেলেছে বিভিন্ন সময়ে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী শুধু একজন বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রবন্ধের রচয়িতা নন, মূলত তিনি একজন কবিও। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে যে-কোনো মহৎ শিল্পীই প্রকৃত প্রস্তাবে কবি। কিন্তু প্রবন্ধরাজ্যে তিনি যেমন অনন্য ও একক—কারো সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যান না, বক্তব্যের ব্যাপারে স্থির ও পৃথক বিশ্বাসে বলীয়ান এবং সত্যনিষ্ঠ, কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি তেমনি অনন্য ও উদার। সেখানেও তাঁর পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও সুন্দর অন্বেষার পরিচয় স্ফুট। তাই তিনি তাঁর প্রার্থনায় যাচনা করেন :

> হে আল্লাহ!
> বুদ্ধি দাও, শান্তি দাও, অনুভূতি দাও, কল্পনা দাও।
> সৃষ্টিপথের মর্মকোষের মধুপানের ক্ষমতা দাও।
> জীবনকে আনন্দিত করো, সার্থক করো, উজ্জ্বল করো ;
> উদ্যোগী করো, প্রাণবান করো, নিষ্ঠাবান করো।
> অন্তরে নিয়ত শিখার মতো আলো—
> বিবেকরূপে, বিচারবুদ্ধিরূপে
> আমার প্রার্থনা খাঁটি করো, খাঁটি করো, খাঁটি করো।

[প্রার্থনা : প্রভাতির্ক]

মোতাহের হোসেনের মানসলোকে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সুস্পষ্ট এবং এ কারণেই হয়তো তাঁর মতোই রোমান্টিক কাব্য রচনার চাইতে 'সনেট' রচনাতেই তিনি মুক্তি খুঁজেছেন বেশি।

> দীন আমি, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই
> আনন্দ-কণিকা মাগি। কোথা নাহি পাই
> সে পরম ধনটুকু ; তাই নিশিদিন
> প্রাণ মোর বহে শুষ্ক মধু ছন্দোহীন!
> হৃদয় মরুভূ মাঝে ফোটেনাকো ফুল
> হাসে না মধুর হাসি, করে না আকুল
> নীরস জীবন মম। রহি ম্রিয়মাণ।
> পরাণে বাজিয়া উঠে বিষাদের গান।
> কাঙাল পরাণ মোর সকলের কাছে
> প্রাণ দাও, প্রেম দাও—এই ভিক্ষা যাচে৷

[চতুর্দশপদী]

শুধু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন নম্র, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নিরহঙ্কার ও রসজ্ঞ। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। আবুল ফজল লিখেছেন : "তাঁর কথা ও ব্যবহারে রুক্ষতা, কঠোরতা ছিল না, তাঁকে কোনোদিন ধৈর্য হারাতে দেখা যায় নি। তাঁর স্বভাব ও ব্যবহারে বিনম্র মাধুর্য ও আলাপ আলোচনায় সরস পরিহাসপ্রিয়তা শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। ছাত্রদের সঙ্গেও ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটে নি কোনোদিন।" মোতাহের হোসেন চৌধুরীকে আবুল ফজল যৌবনে পেয়েছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' বুদ্ধির মুক্তির দলে এবং পরে পেয়েছিলেন অধ্যাপনা জীবনে চট্টগ্রাম কলেজে সহকর্মী হিসেবে। সুতরাং তাঁর চোখে মোতাহেরের ব্যক্তিগত জীবনের এই পরিচয় নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী আমাদের সাহিত্যে সেইসব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁরা আপন চিন্তা ও আদর্শকে স্বার্থ বা নিজের প্রয়োজনের জন্যে বিসর্জন দেননি। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা হয়তো অতি-প্রগতিশীল নয় এবং হয়তো এটা স্বাভাবিকও ; কেননা তাঁর সমস্ত চিন্তা বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ব্যক্তি। সমষ্টিগত কল্যাণ চেতনা বা শ্রেণীহীন সমাজগঠন তাঁর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হয়তো এ কারণেই তিনি অতি-প্রগতিবাদী নন বা কোনো বিশেষ আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ হিসাবে ধরে নেন নি। তাঁর প্রধান আদর্শ মানবিকতাবাদ। এসব কারণে সমকালীন রাজনৈতিক উত্থান-পতন বা আলোড়নসমূহ তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। এমনকি আঁদ্রে মারোয়ার মতো সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে ব্যক্তি বিকাশের অন্তরায় বলেও সমালোচনা করেছেন তিনি। অন্যদিকে, একই সঙ্গে এবং প্রায় একই কারণে, তিনি ধর্মান্ধতা ও শাস্ত্রানুগত্যকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন : "শাস্ত্রানুগত্য নয়, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মোপলব্ধিই পৃথিবীকে সাম্য-মৈত্রীর পুণ্যমন্দিরে পরিণত করতে পারে সুন্দর পৃথিবীকে সুন্দরতম করবার এ-ই সহজতম পন্থা। বিংশ শতকের মানবতাবাদী শিল্পী রমাঁ রোলাঁর কণ্ঠে একদা শোনা গিয়েছিল—

"Broaden yourself or perish. Embrace all new and free forces of the world you are suffocating in your old shells, which are glorious but fossilised. Break them down. Breathe and let us breath".

মোতাহের চৌধুরীর কণ্ঠেও এ ধ্বনিটিই সুকুমার ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে।

শফিউল আলম

সূচি

সংস্কৃতি–কথা ১৩
মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার ২৬
রিনেসাঁস : গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ৩৬
ব্যর্থতা জিন্দাবাদ ৪৯
দুঃখবাদ ৫৭
সম্মান ও আত্মসম্মান ৬৬
মেরুদণ্ড ৭৫
মনুষ্যত্ব ৮২

সংস্কৃতি-কথা

ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা—সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।

ধর্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ। মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে। বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনাই তাদের চালক, তাই তাদের জন্য ধর্মের ততটা দরকার হয় না। বরং তাদের উপর ধর্ম তথা বাইরের নীতি চাপাতে গেলে ক্ষতি হয়। কেননা তাতে তাদের সূক্ষ্ম চেতনাটি নষ্ট হয়ে যায়, আর সূক্ষ্ম চেতনার অপর নাম আত্মা।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়—উপায়। উদ্দেশ্য, নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লা সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে সে-ই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়। বাইরের ধর্মকে যারা গ্রহণ করে তারা আল্লাকে জীবনপ্রেরণা রূপে পায় না, ঠোঁটের বুলি রূপে পায়। তাই শ'র উক্তি : Beware of the man whose God is in the skies—আল্লা যার আকাশে তার সম্বন্ধে সাবধান। কেননা, তার দ্বারা যে-কোনো অন্যায় ও নিষ্ঠুর কাজ হতে পারে। আল্লাকে সে স্মরণ করে ইহলোকে মজাসে জীবন-যাপন করবার জন্য আর পরকালে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা স্বর্গে একটা প্রথম শ্রেণীর সিট রিজার্ভ করার আগ্রহে—অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে নয়। ইহকালে ও পরকালে সর্বত্রই একটা ইতর লোভ।

অপরদিকে কালচার্ড লোকেরা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে অন্যায় আর নিষ্ঠুরতাকে; অন্যায় নিষ্ঠুরতাকে তো বটেই, ন্যায় নিষ্ঠুরতাকেও। মানুষকে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তি দিতেও তাদের বুক কাঁপে। নিষ্ঠুর হয়ো না—এই তাদের ভেতরের দেবতার হুকুম আর সে হুকুম তারা তামিল না করে পারে না, কেননা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই একটা ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন বা স্বধর্ম সৃষ্টি করা কালচারের উদ্দেশ্য। যেখানে তা নেই সেখানে আর যাই থাক কালচার নেই। কালচার একটা ব্যক্তিগত ধর্ম। ব্যক্তির ভেতরের 'আমি'কে সুন্দর করে তোলাই তার কাজ।

কালচার সমাজতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক। নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো—এ-ই কালচারের আদেশ। এবং এই আদেশের সফলতার দিকে নজর রেখেই তা সমাজতন্ত্রের সমর্থক। সমাজতন্ত্র তার কাছে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। কালচার ব্যক্তিতান্ত্রিক এ-কথা বললে এ বোঝায় না যে, কালচার্ড মানুষ সমাজের ধার ধারে না, সে

দলছাড়া, গোত্রছাড়া জীব। তা নয়, সমাজের ধার সে খুবই ধারে। নইলে প্রাণ পাবে কোত্থেকে? ব্যক্তি তো নদী, সমাজ সমুদ্র। সমুদ্রের সঙ্গে যোগ-যুক্ত না হলে সে বাঁচবে কী উপায়ে? সুতরাং নিজের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই কালচার্ড মানুষ সমাজের কথা ভাবে, এমনকি দরকার হলে সমাজের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। সংস্কৃতিবান মানুষ ব্যক্তিতান্ত্রিক এই অর্থে যে, সমাজ বা অর্থনীতির কথা ভেবে সে নিজের অসৌন্দর্যকে ক্ষমা করে না। এই সমাজে, এই অর্থনীতির অধীনে এরচেয়ে বেশি সুন্দর হওয়া যায় না, এ-কথা বলে নিজেকে কি অপরকে সান্ত্বনা দিতে সে লজ্জাবোধ করে। সে চায় নিজের সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণ উন্মোচন, নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ। নিজের কাছ থেকে ষোলো আনা আদায় করে না নিতে পারলে সে খুশি হয় না। এইজন্য শুধু সমাজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা তার মনঃপূত নয়। কেননা তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যানকল্পনার সম্পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়, এবং নিভৃতবাসী অন্তরপুরুষের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহুভঙ্গিম প্রকাশ নিজের দিকে তাকিয়েই হয়, সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়। অত্যধিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণ-সাইজ করে রাখে—মানুষের চূড়ান্ত বৃদ্ধিতে অন্তরায় ঘটায়। সমাজের আদেশ : দশের মধ্যে এক হও, এগারো হয়ো না। এগারোদের সে সহ্য করে না—যদিও গৌরবের জন্য মাঝে মাঝে মাথায় করে নাচে। কাল্‌চারের আদেশ : দশের মধ্যে এগারো হও, দশের মধ্যে থেকেই নিজেকে নিজের মতো করে, সর্বাঙ্গসুন্দর করে ফুটিয়ে তোলো। তাতেই হবে তোমার দ্বারা সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবা, যদিও সমাজের বিরক্তিভাজন হওয়াই হবে তোমার ভাগ্য।

সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষ আবার নিজেকে গড়ে তোলে শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্যসাধনার সহায়তায়। এই-যে নিজেকে বিশেষভাবে গড়ে তোলা এরই নাম কাল্‌চার। তাই কাল্‌চার্ড মানুষ স্বতন্ত্রসত্তা, আলাদা মানুষ। নিজের চিন্তা, নিজের ভাবনা, নিজের কল্পনার বিকাশ না হলে কাল্‌চার্ড হওয়া যায় না। চিন্তা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে সমতা স্থাপন করে মানুষের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করতে চায় বলে ধর্ম অনেক সময়ে কাল্‌চারের পরিপন্থী। মতবাদীও এ দোষে দোষী, তাই মতবাদী ও ধার্মিকের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই সরকারি গলায় কথা বলে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের উপরে স্টিমরোলার চালাতে ভালোবাসে।

ধর্মের মতো মতবাদও মনের জগতে লেফট্-রাইট্ করতে শেখায়। ধার্মিকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ভয় আর পুরস্কারের লোভ। সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে ওসবের বালাই নেই। তারা সবকিছু করে ভালোবাসার তাগিদে। সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা, বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা—এরই নাম সংস্কৃতি। তাই ধার্মিকের পুরস্কারটি যেখানে বহুদূরে থাকে, সংস্কৃতিবান মানুষ সেখানে তার পুরস্কারটি পায় হাতে হাতে, কেননা কাজটি তার ভালোবাসার অভিব্যক্তি বলে তার আনন্দ, আর আনন্দই তার পুরস্কার। সে তার নিজের স্বর্গটি নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। বাইরের স্বর্গের জন্য তাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয় না। তার উক্তি :

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোক আঁধার।

শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

পরম বেদনায়, অসংখ্য দুঃখের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে অন্তরে যে গোলাপ ফুটিয়ে তোলে তাই তার স্বর্গ। সেই সৃষ্টি করা এবং তা অপরের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা, এ-ই কালচার্ড জীবনের উদ্দেশ্য। এই কথা যখন অন্তরে জাগে তখন বাইরেও তার প্রভাব উপলব্ধ হয়। তখন স্বতঃই বলতে ইচ্ছে হয় :

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ কল্লোলে।

ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে নয়। জীবনের গোলাপ ফোটানোর দিকে তার নজর নেই, চক্ষুটিকে নিষ্কণ্টক রাখাই তার উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে কাল্‌চারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের বিকাশ, পতন পাপ থেকে রক্ষা নয়। গোলাপের সঙ্গে যদি দু-একটা কাঁটা এসেই যায় তো আসুক না, তাতে ক্ষতি নেই, দেখতে হবে শুধু ফুল ফুটল কি-না—এ-ই কাল্‌চারের অভিমত। মনুষ্যত্বের বিকাশই সবচেয়ে বড় কথা, চলার পথে যে স্খলন-পতন তা থেকে রক্ষা পাওয়াটাই বড় কথা নয়। বরং বড় জীবনের তাগিদে এসে এই স্খলন-পতনের মর্যাদাও বেড়ে যায় অনেকখানি।

বিকাশকে বড় করে দেখে না বলে ধর্ম সাধারণত ইন্দ্রিয় সাধনার পরিপন্থী। অথচ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবনসাধনারই অপর নাম কাল্‌চার। মন ও আত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত করে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের নবজন্মদানই কাল্‌চারের উদ্দেশ্য। অবশ্য এই ইন্দ্রিয়নিচয়ের সবকটিই যে সমতুল্য তা নয়। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে চক্ষু আর কানই সেরা। তাই তাদের স্থান সকলের আগে দেওয়া হয়েছে। চোখের মানে ছবির সাধনা, কানের সাধনা গানের। (সাহিত্যের মধ্যে চোখ ও কান উভয়েরই কাজ রয়েছে,কেননা তা ছন্দ ও ছবি উভয়ের মিলন।) চোখ ও কানের পরেই নাসিকার স্থান—নিশ্বাস গ্রহণের সহায়তায় বাঁচবার সুযোগ দেয় বলে নয়, সুগন্ধ উপলব্ধি দ্বারা আত্মাকে প্রফুল্ল রাখবার সুযোগ দেয় বলে। চোখ ও কান 'আত্মার' জিহ্বা, এদের মারফতেই সে তার খাদ্য চয়ন করে। অথচ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কোনো কোনো ধর্ম এই চোখ ও কানের সাধনারই পরিপন্থী, সেখানে তার পতনের ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তাই আমরা চোখ থাকতেও কানা, কান থাকতেও কালা। সুর বা ছবির সূক্ষ্মতা আমাদের প্রাণে দাগ কাটে না। চোখ ও কানের প্রতি বেখেয়াল থাকা-যে আত্মার প্রতিই বেখেয়াল থাকা, সংস্কৃতিবানরা তা বুঝলেও ধার্মিকের মাথায় তা সহজে ঢোকে না। তাই তারা শুধু ঈশ্বরের নাম নেয়, ঐশ্বর্য উপলব্ধি করে না।*

---

* ঈশ্বরকে চাওয়া মানে ঐশ্বর্যকে চাওয়া। রামকৃষ্ণ বলতেন : ঈশ্বর বেটাকে কে মানত যদি তার ঐশ্বর্য না থাকত? এই উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি-যোগ্য। বিভিন্ন ধর্মের আশ্রয়ে তাঁর যে সাধনা তা চিত্ত সমৃদ্ধিরই সাধনা। পথের বৈচিত্র্যের স্বাদ তিনি পেতে চেয়েছিলেন নইলে পথ যে আসলে এক, তা কি তিনি জানতেন না?

ইন্দ্রিয়ের সাধনা বলে কাল্‌চারের কেন্দ্র নারী। নারীর চোখ-মুখ, স্নেহ-প্রীতি, শ্রী ও হ্রী নিয়েই কাল্‌চারের বাহন শিল্প-সাহিত্যের কারবার। ইন্দ্রিয়গ্রামের জাগরণ ও নিয়ন্ত্রণের মূলেও নারী। 'বোধকলি' তার প্রসাদেই ফোটে, জীবনের শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা নারী থেকেই আসে। তাই কবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : 'আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যদি না পাই তপস্বিনী।' জীবনে তপস্যা করতে চায় বলে নারী-সঙ্গ কাল্‌চার্ড মানুষের এত কাম্য। বৈরাগীরা নারীকে পর করে সংস্কৃতিকেও পর করে। তাই তাদের জীবনে বৃদ্ধি নেই, তারা নিঃস্ব—নব-নব বুদ্ধি ও প্রীতির স্বাদ থেকে বঞ্চিত। কি মানসিক, কি সাংসারিক সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির গোড়ায় নারী। যাত্রাপথে নারীর জয়ধ্বনি পুরুষের জীবন-পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। যে জাতি নারীকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা রাখতে চায় সে জাতি জীবনে মৃত্যুর আরাধনা করে—ইতিহাসের খাতায় সে মরা-জাতির পৃষ্ঠায় নাম লেখায়। তার জীবনে আত্মনির্যাতন আছে, আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই। আর আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই বলে সংস্কৃতিও নেই। কেননা সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ— নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা।

ধর্মের মধ্যে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত রয়েছে। কোনো কোনো ধর্ম নারীকে দেখেছে বিষের নজরে, আর কোনো কোনো ধর্ম ততটা না গেলেও সঙ্গীত-নৃত্যের মারফতে নারীকে ঘিরে যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি তাতে জানিয়েছে ঘোর আপত্তি। সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি তার কাছে কামেরই আয়োজন, কামের উন্নয়ন নয়। ফলে সূক্ষ্ম উপভোগের সহায় না হয়ে নারী স্থূল ভোগের বস্তু হয়েই রইল, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রেরক ও উচ্চতর জীবনের সহায় হতে আর পারল না। যৌন ব্যাপারে বিশেষ ও কড়া শাসনের ফলে মানুষ তাতেই আকৃষ্ট হয়ে রইল—যৌন সম্ভোগকে অতিক্রম করে যে প্রেম ও আনন্দ তা অনুভব করতে পারলে না বলে। নিষিদ্ধ বস্তু সাধারণত ভীতি ও অতিরিক্ত আকর্ষণ—এই দুই মনোবৃত্তির সংঘর্ষ বাধিয়ে জীবনে বিকৃতি ঘটায়। এখানেও তাই হল যৌন ব্যাপারে মন্দ, এ-কথা না বলে যদি বলা হত : প্রেম ভালো, আনন্দ ভালো, প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, তা হলে পৃথিবীর চেহারা হয়তো এত কদর্য হত না। প্রেমের দ্বারা কাম নিয়ন্ত্রিত হত বলে ব্যভিচার ও বিরোধ উভয়ের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ সহজ ও সুন্দর হতে পারত।

কিন্তু তা না বলে নীতিবিদরা মানুষকে সংযম শিক্ষা করতে বললেন, অথচ কোন্ বড় জিনিসের দিকে তাকিয়ে তা করতে হবে তা বাত্‌লালেন না। কেবল স্বর্গের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর স্বর্গের যে-চিত্রটি আঁকা হল তাতে, এখানে যা ভয়ঙ্কর বলে সাব্যস্ত, সেই ইন্দ্রিয়-বিলাসেরই জয়-জয়কার ঘোষিত হল। তাই ইন্দ্রিয়ভীতি সত্ত্বেও মানুষ ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার দিকে ঝুঁকলে—মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার মতো বড়কিছুর আশ্রয় খুঁজে পেলে না। নীতিবিদদের জানা উচিত ছিল, সংযম বলে কোনো স্বাস্থ্যপ্রদায়ী বস্তু নেই, আছে বড় জিনিসের জন্য প্রতীক্ষা আর সেই বড় জিনিস হচ্ছে প্রেম। যে প্রেমে পড়েছে, অথবা প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করেছে সে-ই প্রতীক্ষা করতে শিখেছে, অর্থাৎ সে-ই সহজে সংযমী হতে শিখেছে, অপরের পক্ষে সংযম মানে পীড়ন আর পীড়ন নিষ্ঠুরতার জনয়িত্রী। যে বিনা কারণে নিজেকে দুঃখ দেয়, অপরকে দুঃখ দিতে তার তিলমাত্রও বাধে না। Sadism-এর গোড়ায় আত্মপীড়ন, এ-কথা মনে রাখা চাই।

নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম উপায় যৌনতৃপ্তি। যৌনতৃপ্তির উপায় কামকে প্রেমের সঙ্গে যুক্ত করা। শুধু কামে তৃপ্তি নেই, তা পরিণামে ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে আসে। প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েই কাম স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে। অথচ সমাজ বিয়ের মারফতে কামের দ্বারটি খোলা রাখলেও (বিয়ে মানে : Sex made-easy), প্রেমের দ্বারটি বন্ধ করে দিয়েছে।

বিবাহিত নর-নারীর প্রেমহীন স্থূল যৌনসম্ভোগে সমাজের আপত্তি নেই, কিন্তু অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকা যদি একটু হাতে হাত রাখে, অথবা ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকায় তবেই যত আপত্তি। প্রীতিকে বড় করে না-দেখে নীতিকে বড় করে দেখার এ-ই স্থূল পরিণতি। বলা হবে সমাজকে রক্ষা করতে হলে এই স্থূলতার প্রয়োজন আছে, অতএব তা দোষাবহ নয়। উত্তরে বলব : হ্যাঁ, সমাজের কাজ তো ঐ পর্যন্তই, নিজের কাঠামোটুকু টিকিয়ে রাখাই তার কাজ, তার বেশি কিছু নয়। ব্যক্তির বিকাশের কথা সে যতটুকু ভাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখার কথা, আর সমাজকে টিকিয়ে রাখা মানে সমাজের মোড়লদের টিকিয়ে রাখা—তাদের স্বার্থকে অক্ষত রাখা। মানুষ গোল্লায় যাক, তবু মোড়লদের জবরদস্তি বজায় থাক, তাই তো সমাজের কাম্য। সমাজ মানুষের বৃদ্ধি চায় না, চায় একটা ছাঁচের মধ্যে ফেলে তাকে কোনোপ্রকারে টিকিয়ে রাখতে—তার চূড়ান্ত বৃদ্ধিতে বাধা দিতে।

তাই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের ভার নিয়েছে কাল্‌চার। যৌনব্যভিচারের দ্বারা লোকটি নিজেকে ও সমাজকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে কি না সেদিকে তার নজর নেই। শকুনের মতো সে মরা গরুর সন্ধানে থাকে না, বুলবুলের মতো তার দৃষ্টি থাকে গোলাপকুঞ্জের দিকে। লোকটির মনে সৌন্দর্য ও প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় কি না, তার বুকে মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য সজীব দরদ আছে কি না, নিষ্ঠুরতাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে কি না, তা-ই সে দেখতে চায়, এবং দেখতে পেলে খুশি হয়ে সাত খুন মাফ করে দেয়। কেননা, সে জানে প্রেম ও সৌন্দর্যের পূজারীদের জীবনে এখানে-সেখানে স্খলন-পতন থাকলেও যাকে বলা হয় ব্যভিচার তা কখনো থাকতে পারে না। লোভ ও লালসার হাতে ক্রীড়নক হতে চায় না বলে তার সর্বদা পবিত্র-গঙ্গাধারার মতো কখনো কখনো পঙ্কিলতা বহন করেও অপঙ্কিল। কিন্তু পঙ্কিলতা, অপঙ্কিলতার প্রতি ধার্মিকের দৃষ্টি নেই। তার দৃষ্টি কেবল নীতিরক্ষার দিকে। নীতিরক্ষা হলেই ব্যস, লেফাফাদুরস্তি ও লেবাসপোরস্তিই তার কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। আত্মার দিকে তার নজর নেই, নীতিরক্ষী নির্দয় ও নিষ্প্রাণ মানুষকেও সে শ্রদ্ধা জানায়।

কামকে দমাতে গিয়ে ধর্ম ও ধর্মসৃষ্ট সমাজ প্রেমকেই দমায়। প্রেম মরে যায়, কাম গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ করে টিকে থাকে—মুখ নিচু করে চোরের মতো চলে। সমাজ তাতেই খুশি। কেননা, সে ভীরুতাই পছন্দ করে, সাহস নয়। প্রেম অন্যায়কারী বলে নয়, সাহসী বলেই সমাজের যত ক্রোধ তার উপরে গিয়ে পড়ে। প্রেমিকের আচরণে একটা চ্যালেঞ্জ দেখতে পায় বলে সে তাকে সহ্য করতে পারে না। (সমাজ যেন নীরব ভাষায় বলে ডুবে-ডুবে জল খা না—কে তাতে আপত্তি করে? অত দেখিয়ে দেখিয়ে খাচ্ছিস যে, সাহসের বাড় বেড়েছে বুঝি? আচ্ছা দাঁড়া, তোর বড়াই ভাঙছি।) গোপনে পাপ করে চলো কেউ কিছু বলবে না; না জানলে

তো নয়ই, জানলেও না। তুমি যে মাথা হেঁট করে চলেছ তাতেই সকলে খুশি, তোমাকে অবনতশিরই তারা দেখতে চায়। প্রেমের শির উন্নত বলেই তার বিপদ—সমাজের যত বজ্রবাণ তার মাথার ওপরেই বর্ষিত হয়।

নীতির ব্যর্থতার-যে এই একটি দিকই তা নয়, অন্য দিকও আছে। একটি ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুন জীবনের সর্বত্র তার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে না। যৌনব্যভিচারী যেমন সমাজের চক্ষুশূল, উৎকোচগ্রহণকারী বা ব্লাকমার্কেটিয়ার তেমনটি নয়। অথচ যৌনব্যভিচারের চেয়ে উৎকোচ গ্রহণ আর কালোবাজারি-যে সমাজের পক্ষে কম অকল্যাণকর তা কেউ বলবে না। নীতির কেন্দ্রীভবনজাত এই শোচনীয়তা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে নীতির বিকেন্দ্রীকরণ। যাদের নীতিবোধ একটা নির্জীব সংস্কার মাত্র নয়, সজীব উপলব্ধির ব্যাপার, তারা তা মানতে বাধ্য। য়ুরোপে নীতির বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে বলেই জীবনের সর্বত্র, বিশেষ করে অর্থের ব্যাপারে, তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। একটি ব্যাপারেই আবদ্ধ হয়ে না থাকায় ঘৃণা সেখানে জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। যৌনব্যভিচারীর চেয়ে উৎকোচগ্রহণকারী সেখানে বেশি বৈ কম ঘৃণার পাত্র নয়। আমাদের এখানে কিন্তু ঠিক তার উল্‌টো। আমরা যৌনব্যভিচারীকে দেখলে নাসিকা কুঞ্চিত করি, অথচ উৎকোচগ্রহণকারীকে শ্রেষ্ঠ আসনটি দিতেও দ্বিধা করিনে।

বাইরের নীতির এই-যে অস্বাস্থ্যকর প্রাধান্য, এর প্রতিবাদ রয়েছে হিন্দুপুরাণে। সত্যিকার মনুষ্যত্বের অধিকারী বলে তথাকথিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীরা সেখানে প্রাতঃস্মরণীয় ও প্রাতঃস্মরণীয়া বলে গৃহীত। কাল্‌চারের গোড়ার কথা-যে মূল্যবোধ, তা পুরাণকারদের ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় নীতিকে বড় করে না-দেখে তাঁরা অন্তরাত্মার মহিমাকেই বড় করে দেখেছেন, আর যেখানেই তা দেখতে পেয়েছেন সেখানেই শ্রদ্ধায় অবনতশির হয়েছেন। মনুষ্যত্ব তথা সজীব দয়া-মায়া স্নেহ-প্রীতি ও মহত্ত্বই তাঁদের পূজ্য। নীতির খোলস ভেদ করে তাঁরা মানুষের মর্মকে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। পুরাণকারদের সেই ধারা বয়ে শরৎবাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পুরাণকারদের মতো তিনিও সত্যিকার মনুষ্যত্ব তথা মহত্ত্বের খোঁজে—মহত্ত্বই তাঁর কাছে মনুষ্যত্ব আর কিছু নয়—যাত্রা করেন এবং সমাজপরিত্যক্ত তথাকথিত পতিত-পতিতাদের মধ্যেই তার সাক্ষাৎ পান, সভ্যভব্য নীতিপরায়ণদের জীবনে নয়। সেখানে তিনি দেখতে পেয়েছেন শুধু মিথ্যার খেলা আর সঙ্কীর্ণতার জয়জয়কার। লেফাফাদুরস্তি ও লেবাসপোরস্তি ঠিকই আছে, নাই কেবল মনুষ্যত্বের প্রতি ঐকান্তিক টান—যার ফলে মানুষ সঙ্কটসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না।

কিন্তু হিন্দুপুরাণের ধারাবাহী শরৎবাবু সম্বন্ধে যখন হিন্দু অধ্যাপককেই সাবধানবাক্য উচ্চারণ করতে শুনি তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। হিন্দুর ঐতিহ্য-যে নীতির ঐতিহ্য নয়, নীতির চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় প্রীতির ঐতিহ্য, মহত্ত্বের ঐতিহ্য হিন্দুঐতিহ্যের ধ্বজাবাহী অধ্যাপক মশাই তা-ই উপলব্ধি করতে পারেন না। যাঁর কথা বলা হল, তিনি আমারও শিক্ষক আর শিক্ষক কি মুরুব্বির সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারিনে—ঘাবড়ে যাই, থতমত খেয়ে যাই। নইলে তাঁকে বলতুম, শরৎবাবু সম্বন্ধে তো ছেলেদের সাবধান করে দিলেন স্যার, কিন্তু শরৎবাবু যার

ধারাবাহী সেই পুরাণ সম্বন্ধে তো কিছু বললেন না—বিষবৃক্ষের আগাটা কাটা হল বটে, কিন্তু গোড়াটা রয়ে গেল যে। উত্তরে তিনি কী বলতেন জানিনে, তবে যা বলতেন তা বোধহয় এইরকম একটা-কিছু আন্দাজ করা যায় : হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয় ও প্রাতঃস্মরণীয়াদের জীবনে যা ঘটেছে তা তাঁদের জীবনেই খাটে, অন্যের জীবনে নয়; এ-কথা হিন্দু জানে, তাকে সে-কথা বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

জানে বৈকি, নইলে হিন্দুর পতন হবে কী করে? যেদিন থেকে হিন্দু, দেবতাদের জন্য এক জীবন আর নিজের জন্য অন্য জীবন মেনে নিলে সেদিন থেকেই তো তার পতনের সূত্রপাত হল—নীতিধর্মী, অশক্ত, বেদনাবিহীন, দুর্বল জীবন কামনা করার ফলে। জীবনের সমৃদ্ধিকে কামনা না করে কোনোপ্রকারে টিকে থাকাকেই সে বাঞ্ছনীয় মনে করলে। আর সত্যি-সত্যি কোনোপ্রকারেই সে টিকে রইল—museum specimen হয়ে। সেদিন থেকে হিন্দুসমাজে নীতিধর্মী মাঝারির রাজত্ব স্থাপিত হল, এবং অ-নীতিধর্মী মহতেরা অন্তর্ধান করলে। মহতেরা বললে : তোমার নীতি আমি মানিনে। .... জীবন নিয়ে পরীক্ষা করবার অধিকার আমার আছে। আমার ভেতরে যে অমৃত লুকিয়ে আছে তা আমার চাই-ই। আর তা আমাকে আবিষ্কার করে নিতে হবে, তোমার দেওয়া ধরাবাঁধা নীতির অনুসরণ করলে পাওয়া যাবে না। কে তোমাকে শেষ কথা বলার অধিকার দিয়েছে? আমি যে অশেষের পূজারী। ছোট ছোট নীতির বাঁধনে বেঁধে আমার জীবনকে, আমার আগমনকে ব্যর্থ করে দিও না, আমাকেই আমার উদ্ধারকর্তা হতে দাও, আমার জীবনের নিয়ামক হতে দাও। নীতিধর্মী মাঝারি বললে : চুপ করো, অত সাহস দেখিয়ো না, ঐ পরীক্ষাতে বিলক্ষণ ভয়ের কারণ আছে, ওখানে উন্নতির সম্ভাবনার চেয়ে পতনের সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং সাবধান। উন্নতি না হলে থোড়াই ভাবনা, পতন না হলেই হল। আমার দেওয়া এই নীতির মাদুলি পরিধান করো, পতন থেকে রক্ষা পাবে, আর এই রক্ষা পাওয়াটাই বড় কথা। দেখো না চারিদিকে কেবলই পতনের ফাঁদ। আমার কথা শুনলে তুমি অমৃত পাবে না বটে, কিন্তু বিষ থেকে বেঁচে যাবে। আর তা-ই তো চাই, অমৃত না-খেলেও বাঁচা যায় কিন্তু বিষ খেলে তো বাঁচা যায় না। উত্তরে মুহূর্তকামীরা বললে : তাহলে বিদায়, এক্সপেরিমেন্টের ক্ষুধা আমার রক্তে, তোমার রাজ্যে আমার স্থান নেই। আমি অমৃতাভিসারী, মরণ ভয় আমার নেই। শুধু কোনোপ্রকারে টিকে থাকার সাধনা আমার নয়। মাঝারিরা বললে: ভালোই হল, আপদ গেছে। আমাদের সনাতন শান্তির রাজ্যে সে অশান্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। কী কেবল অমৃত অমৃত করে! অমৃত কি মানুষের? সে তো দেবতার। দেবতার পাতে হাত দিতে চায় যত অকালকুষ্মাণ্ডরা!

দেবতার জন্য প্রেম, দেবতার জন্য মুহূর্ত, দেবতার জন্য সমৃদ্ধি। আমরা শুধু জন্মগ্রহণ করেছি আপিসের বড়বাবুটি হয়ে, বে-থা করে নিশ্চিন্তে ছেলের মাথায় হাতটি রেখে মরে যাওয়ার জন্য। দূরাভিসারী চিত্ত আমাদের নয়, কঠিনের সাধনাকে আমরা ভয় করি। তাই প্রেমকে ভয় করি, মহত্ত্বকে ভয় করি, জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ভয় করি। মৃত্যুর পরে যার তহবিলে কিছু টাকাপয়সা পাওয়া যায়, সে ব্যক্তিই আমাদের কাছে সার্থক মানুষ, তারই প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ। আমাদের ছেলেদের তারই চরিত্র অধ্যয়ন ও অনুসরণ করতে বলি।

ভুলে যাই যে, অন্তরের দিক দিয়ে যে যতবেশি ছোট, তারি তত বেশি টাকাপয়সা জমাবার সম্ভাবনা। ছোটলোকমির সাধনাই আমাদের কাছে জীবন-সাধনা হয়ে দাঁড়ায়। নীতি এ সাধনার সহায়ক, একটা ধরাবাঁধা পদ্ধতির অনুসরণ না করলে আর যাই করা যাক টাকাপয়সা করা যায় না। তাই আমরা নীতিধর্মী হয়েছি।

কথায় কথায় হিন্দুর উন্নতি-অবনতির কথা এসে পড়ল। ভালোই হল, কথায় বলে নসিহতের চেয়ে নজির ভালো। আর এ নজিরে বিপদের সম্ভাবনা কম। কারণ, আর যে-কারণেই হোক ধর্মের সমালোচনায় হিন্দু, অন্তত বাঙালি হিন্দু, উদ্দণ্ড হয় না। ধর্ম ব্যাপারে পাশাপাশি বিভিন্ন মতবাদ চলার দরুন সে অনেকখানি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অর্জন করেছে।

ধার্মিক আর কাল্‌চার্ড মানুষে আরেকটা লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য এই যে, ধার্মিকের চেয়ে কাল্‌চার্ড মানুষের বন্ধন অনেক বেশি। উল্‌টা কথার মতো শোনালেও, কথাটি সত্য। ধার্মিকের কয়েকটি মোটা বন্ধন, সংস্কৃতিবান মানুষের বন্ধনের অন্ত নেই। অসংখ্য সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যে বাঁধা সে-ই তো ফ্রি-থিংকার আর ফ্রি-থিংকিং কাল্‌চারের দান। যেখানে ফ্রি-থিংকিং নেই সেখানে কাল্‌চার নেই।

প্রশ্ন হবে : ধর্ম আর কাল্‌চারকে যেভাবে আলাদা করে দেখা হল তাতে মনে হচ্ছে নাকি ধার্মিক কখনো প্রকৃত অর্থে কাল্‌চার্ড হতে পারে না? কিন্তু কথাটি কি সত্য? ধার্মিকদের মধ্যেও তো অনেক কাল্‌চার্ড লোক দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরে বলব : তা বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে, সেখানেও কাল্‌চারই কাল্‌চার্ড হওয়ার হেতু। অনুভূতি, কল্পনার সাধনা করেছেন বলেই তাঁরা কাল্‌চার্ড, অন্য কারণে নয়।

একটা অভিজ্ঞতার সহায়তায় আমি কথাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি। আমি মিলিটারি কন্ট্রাক্‌টারের খাতায় নাম লেখানোর দরুন পাদরি ওয়াট্‌সন সাহেব যা বলেছিলেন তা এখানে মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন : কবিত্বের প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কন্ট্রাক্‌টার, বিশেষ করে মিলিটারি কন্ট্রাকটার হওয়া অপরাধ, মহাঅপরাধ। নিজের প্রতিভাকে মরতে দেওয়া আর নিজের আত্মাকে মরতে দেওয়া এক কথা। তুমি নিজেকে মরতে দিতে পার, কিন্তু নিজের আত্মাকে মরতে দিতে পার না। যে-পেশা গ্রহণ করলে তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা, তুমি সে পেশা গ্রহণ করেছ শুনে আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি চাই তুমি না-খেয়ে মরো তথাপি তোমার সূক্ষ্মানুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখো, কেননা সূক্ষ্মানুভূতিরই অপর নাম আত্মা। তুমি বলবে তোমার সামান্য প্রতিভা, আর little genius is a great bondage —সামান্য প্রতিভা, কঠিন বন্ধন। কিন্তু সামান্য হলেও তা মূল্যবান। আর যা মূল্যবান তার যত্ন না-নেওয়া মহাপাপ। বুঝলে? কথায় বলে, ভালো লোকদের ভাত নেই। তোমার ভাত না থাক, কিন্তু ভালোও বজায় থাক, এই আমার কামনা।

তখন মার্ক্সের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়নি। তাই কথাটা শুনে খুশি হয়ে ঘরে ফিরে এলাম, কোনো তর্ক না করে। এখনো মাঝে মাঝে আমার সেই বোকামিকে আমি চুমু খাই। কেননা, আমি জানি খুশি হওয়ার জন্যে বোকা হওয়ার প্রয়োজন আছে। বাইবেলের ভাষাটা

একটু বদলে দিয়ে বলা যায় : Blessed are the simple hearted for they shall he happy.*

এখন এই যে মূল্যবোধ, এই যে সূক্ষ্ম অনুভূতি আর আত্মাকে এক করে দেখার প্রবৃত্তি—এ-কি ধর্মের দান, না কালচারের কীর্তি? কই সচরাচর তো ধার্মিকের মুখে এ-ধরনের সুন্দর কথা শুনতে পাওয়া যায় না। তার কাছে তো আল্লার হুকুম আর বেহেশত দোজখই বড় হয়ে ওঠে, সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা নয়। সূক্ষ্ম অনুভূতি কালচারের দান। Human value সম্বন্ধে কাল্‌চারই মানুষকে সচেতন করে। তবে কাল্‌চার্ড মানুষ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে কেন? উত্তর, আরামের জন্য। একটা বিশ্বাসের আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সহজে জীবন যাপন করা যায় বলেই তিনি তা করেন। যে ধর্মকে তিনি আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেন তাতে তিনি নিজেরই কাল্‌চার্ড মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পান, এবং দেখতে পেয়ে ঘোষণা করে বেড়ান : দেখো, দেখো এখানে সব আছে, এখানে এসো; কাল্‌চার্ড মনের উপযোগী ধর্ম যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা এখানে, এখানে, এখানে।—ব্যাপারটা যে মোটের ওপর তাঁরি মনের প্রতিফলন, বাইরের তেমনি কিছু নয়, তা তিনি টের পান না। প্রেমিক যেমন নিগ্রো মেয়ের ভুরুতেও হেলেনীয় সৌন্দর্য দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকে, এখানেও তেমন একটা ব্যাপার ঘটে। তা তিনি মুগ্ধ হয়ে থাকুন কিন্তু তাঁর 'সুন্দরী'কে অপরেও সুন্দর বলুক, এমনি একটা গোঁয়ার্তুমি যেন তাঁকে পেয়ে না বসে, এই আমাদের প্রার্থনা।

সংস্কৃতি মানে জীবনের values** সম্বন্ধে ধারণা। ধর্মের মতো মতবাদ বা আদর্শও তা ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার দরকার। অতীতে ধর্ম ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করেছিল, বর্তমানে মতবাদ বা আদর্শ মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করতে পারে। লোকটা মোটের উপর ভালো কি মন্দ সেদিকে আমাদের নজর নেই, তার গায়ে কোন্ দলের মার্কা পড়েছে সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য। মার্কাটি নিজের দলের হলে তার সাত খুন মাফ, না হলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার দোষ বের করা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এই মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি না পেলে কাল্‌চার্ড হওয়া যায় না। মনে রাখা দরকার, ধর্মের সমস্ত দোষ মতবাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। মতবাদী ধার্মিকের মতোই অসহিষ্ণু ও সঙ্কীর্ণ, ধার্মিকের মতোই দলবদ্ধতায় বিশ্বাসী, অধিকন্তু ধার্মিকের চেয়েও নিষ্ঠুর। ধার্মিকের নিষ্ঠুরতার সহায় ছিল ধর্মগ্রন্থের সমর্থন, মতবাদীর সহায় বিজ্ঞান। আমি আমার জন্য নিষ্ঠুর হচ্ছি না, পৃথিবী-উন্নয়নের বিজ্ঞানসম্মত আদর্শের জন্যই নিষ্ঠুর হচ্ছি। অতএব এখানে আমার গৌরব নিহিত, কলঙ্ক নয়। নিষ্ঠুরতাব্যাপারে এই যুক্তিই মতবাদীর আত্মসমর্থনের উপায়। সৌভাগ্যের বিষয় সত্যিকার

---

* এর কিছুদিন পরে আমার এক ধার্মিক বন্ধুকে বললাম : দেখুন তো খ্রিস্টান পাদরিরা কী সুন্দর কথা বলেন, আমাদের মৌলবী সাহেবদের তো এমন সুন্দর কথা বলতে শোনা যায় না। উত্তরে বন্ধুটি বললেন : বোকা কোথাকার, ওদের পাদরিদের যে কাল্‌চার আছে। আমাদের মৌলবী সাহেবদের তা কোথায়? ব্যস্, আমার বোকামির পুরস্কারটি হাতে হাতে পেয়ে গেলাম : কাল্‌চারই যে সৌন্দর্যের কারণ, অন্যকিছু নয়, তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

** অনেকে বলেন হায়ার ভ্যালু, কিন্তু হায়ার ভ্যালু বলে কোনো কথা থাকা উচিত নয়। কেননা, 'ভ্যালু' জিনিসটা নিজেই একটা 'হায়ার' কিছু, সুতরাং হায়ার কথাটা ফাজিল, অতিরিক্ত।

সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবাদী হতে চায় না, মতবাদকে তারা যমের মতো ভয় করে। কেননা, তাদের কাজ বাইরের থেকে কোনো দর্শন গ্রহণ করা নয়, বহু বেদনায় নিজের ভিতর থেকে একটা জীবনদর্শনের জন্ম দেওয়া, এবং দিন দিন তাকে উন্নতির পথে চালনা করা।

আইডিয়ার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের বা নিজের দলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে একটুখানি সন্দেহ রাখা। এই সন্দেহটুকুই মানুষকে সুন্দর করে তোলে, আর সৌন্দর্যই সংস্কৃতির লক্ষ্য। স্কেপ্‌টিসিজমের প্রভাব না থাকলে-যে সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না, এ-তো একরকম অবিসংবাদিত সত্য। মনে রাখা দরকার, সংস্কৃতিবান হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা পথ নেই, বিচিত্র পথ। কার জন্য কোন্ পথটি সার্থক কে বলবে? সেকালে বলা হত যত জীব, তত শিব; একালে বলা যেতে পারে যত সংস্কৃতিবান মানুষ তত সংস্কৃতি-পন্থা। যে-পথটি ধরে মানুষ কাল্‌চার্ড হয় তা অলক্ষ্য না হলেও দুর্লক্ষ্য। তা পরে আবিষ্কার করা যায়, আগে নয়। তাই সংস্কৃতিবান মানুষটি একটা আলাদা মানুষ, স্বতন্ত্র সত্তা। তার জীবনের একটি আলাদা স্বাদ, আলাদা ব্যঞ্জনা থাকে। সে মতবাদীর মতো বুলি আওড়ায় না, তার প্রতিকথায় আত্মা স্পন্দিত হয়ে ওঠে। প্রেমের ব্যাপারে, সৌন্দর্যের ব্যাপারে, এমনকি সাধারণত ধর্মীয় কল্যাণের ব্যাপারেও তার আত্মার ঝল্‌কানি দেখতে পাওয়া যায়। নিজের পথটি নিজেই তৈরি করে নেয় বলে সে নিজেই নিজের নবী হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে স্বাতন্ত্র্যধর্মী, গোলে হরিবোলের জগতে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কল্যাণের ব্যাপারে সাম্যকে স্বীকার করলেও প্রেমের ব্যাপারে, সৌন্দর্যের ব্যাপারে, চিন্তার ব্যাপারে সে স্বাতন্ত্র্য তথা বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী। সত্যকার সংস্কৃতিকামীরা নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করতে চায় না। নকল যিশু, নকল বুদ্ধ, নকল মার্ক্স বা নকল লেনিন হওয়া তাদের মনঃপূত নয়। ক্ষুদ্র হলেও তারা খাঁটি কিছু হতে চায়!

কিন্তু পথের বিভিন্নতা থাকলেও তাদের লক্ষ্যের সাম্য রয়েছে—সকলেই অমৃত তথা আত্মাকে চায়। যিশুখ্রিস্ট যখন বলেন : For what is man profited if he shall gain the whole world, and lose his own soul?—তখন সংস্কৃতিকামীর অন্তরের কথাই বলেন। এই খ্রিস্টবাণীরই ঔপনিষদিক ভাবান্তর হচ্ছে 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম'—যা দিয়ে আমি অমৃত লাভ করব না তা দিয়ে আমি কী করব? অমৃতকে কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা, এই তো সংস্কৃতি। এইজন্য সংস্কৃতিকে একটা আলাদা ধর্ম, উচ্চস্তরের ধর্ম বলা হয়েছে। প্রাণিজীবনের ঊর্ধ্বে যে-জীবন রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে, এবং তার দ্বারা প্রাণিজীবনকে খণ্ডিত করে দিয়ে, তা মানুষের অন্তরে মুক্তির স্বাদ নিয়ে আসে। তাই বলে প্রাণিজীবনের তথা ক্ষুৎপিপাসার মূল্য যে তা দেয় না তা নয়। খুবই দেয়। Man doesnot live by bread alone —এই কথাটার মধ্যেই ক্ষুৎপিপাসার স্বীকৃতি রয়েছে। তবে মর্যাদাভেদ আছে। যা নিয়ে বাঁচা যায়, আর যার জন্য বাঁচতে হয়, তা কখনো এক মর্যাদা পেতে পারে না। তাই সংস্কৃতিকামীদের ইচ্ছা : ক্ষুৎপিপাসার জগৎটি তৈরি করা হোক ক্ষুৎপিপাসার ঊর্ধ্বে যে-জগৎটি রয়েছে তারই পানে লক্ষ্য রেখে। নইলে সংস্কৃতি ব্যাহত হবে। সংস্কৃতিকামীরা আরো কামনা করে : ক্ষুৎপিপাসার জগৎ তথা কল্যাণের জগৎ নির্মাণে লক্ষ্যের চেয়ে উপায়কে যেন কম বড় স্থান দেওয়া না হয়।

কেননা, উপায়ই চরিত্রের স্রষ্টা, লক্ষ্য নয়। একবার একরকম চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেলে পরে তার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় যে ধনধারা আবদ্ধ হয়ে আছে, ভগীরথের মতো সমতলভূমিতে নামিয়ে এনে তাকে সাধারণের ভোগের বস্তু করতে না পারলে জগতের মুক্তি নেই—এ-কথা স্বীকার করলেও, এই একটি সুরই সংস্কৃতিকামীদের জীবনে বেজে ওঠে না, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রসুরের সমারোহ দেখা দেয়। একসুরা, একঝোঁকা জীবন যে দীন জীবন, তা তারা জানে। বিভিন্ন, এমনকি বিপরীত সুরের চমকে সিম্‌ফনি সৃষ্টি করতে না পারলে তারা খুশি হয় না। তাদের জীবনবীণাটি একতারা নয়, বহুতারসমন্বিত। তাই একত্ববাদে তাদের এত আপত্তি। একত্ববাদী তথা মতবাদীরা অনেক সময় সূক্ষ্ম তারগুলিকে আমলই দিতে চায় না, অথচ প্রকৃত সংস্কৃতিকামীদের নজর সে-দিকেই। মতবাদীর সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, একটি আদর্শের আলোকে সমস্ত কিছু দেখতে চায় বলে সে অবজেকটিভ তথা তন্ময় হতে পারে না। অবজেকটিভ হতে হলে নিজেকে লুকোতে হয়। মতবাদী, নিজেকে, তথা নিজের মতটিকে লুকোতে পারে না বলে বিচিত্র ভাব ও অনুভূতির আগার মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। সে কেবল নিজের মতবাদটিকেই খোঁজে, বারে বারে ফিরে ফিরে তার সেই এক কথা। বিভিন্ন ব্যাপারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, এমনকি একটি ব্যাপারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে না জানলে-যে জীবন দরিদ্র থেকে যায় তা সে বোঝে না। আদর্শের গোঁড়ামির দরুন সে বৈচিত্র্যবোধ তথা জীবনবোধ হারিয়ে বসে। তাই কান পাততে নয়, মুখ খুলতেই সে পটু। অথচ কান পাতাতেই সংস্কৃতি, মুখ খোলাতে নয়। কান পাতার ফলে যখন লোকের মনের বিচিত্র ভাব ও অনুভূতি এসে আপনার অন্তরকে অজ্ঞাতসারে ভরে তোলে, তখনই আপনি অভাবিতের দেখা পান। মুখ খুললে শুধু 'ভাবিতে'র প্রকাশ। মতবাদী কান পাততে জানে না বলে অন্তরের দিক দিয়ে মরে যায়, যদিও হইচই করে বলে ভাবে, সে-ই সবচেয়ে বেশি বেঁচে আছে। প্রবলভাবে বাঁচা বাঁচা নয়, মৃত্যু। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচাই বাঁচা—সংস্কৃতিকামীই এ-সত্য উপলব্ধি করতে পারে। মতবাদ ঝড়ের মতো এসে জীবনের সমস্ত মুকুল ঝরিয়ে দেয়। সংস্কৃতি ঠিক তার উল্টো, দখিন হাওয়ার মতো জীবনের সমস্ত ফুল ফুটিয়ে তোলাই তার কাজ। তখন কত রং, কত বৈচিত্র্য, কত সৌন্দর্য। একসুরা, একরঙা জীবন মতবাদীর; সংস্কৃতিকামীর নয়। সংস্কৃতিসাধনা বহুভঙ্গিম জীবনের সাধনা। Let us agree to differ—'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'—এই উক্তিতে মতবাদীর আস্থা কম। অথচ সংস্কৃতিকামীর কাছে এরচেয়ে শ্রদ্ধেয় বাণী আর নেই।

সাধারণ লোকের কাছে প্রগতি আর সভ্যতার কোনো পার্থক্য নেই। যা সভ্যতা তা-ই প্রগতি, অথবা যা প্রগতি তা-ই সভ্যতা। কিন্তু কাল্‌চার্ড লোকেরা তা স্বীকার করে না। উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বন্ধে তারা সচেতন। প্রগতি তাদের কাছে মোটের উপর জ্ঞানের ব্যাপার। কেননা, জ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীলতা অবধারিত, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নয়। তাই জ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানপ্রসূত কল্যাণকেই তারা প্রগতি মনে করে। প্রকৃতিবিজয়লব্ধ সমৃদ্ধির সার্থক বিতরণই তাদের কাছে প্রগতি। কিন্তু সভ্যতা শুধু প্রগতি

নয়, আরো কিছু। প্রগতির সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে সভ্যতা হয় না। আর সৌন্দর্য ও প্রেমের ব্যাপারটা তথা শিল্পের ব্যাপারটা—কেননা শিল্প, সৌন্দর্য ও প্রেমেরই অভিব্যক্তি—চিরন্তন ব্যাপার, প্রগতির ব্যাপার নয়। এ-সম্বন্ধে গিল্‌বার্ট মারের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য : Doubtless there is in every art an element of knowledge or science, and that element is progressive. But there is another element, too, which does not depend on knowledge and which does not progress but has a kind of stationary and eternal value, like the beauty of the dawn, or the love of a mother for her child, or the joy of a young animal in being alive, or the courage of a martyr facing torment. We cannot, for all our progress, get beyond these things; there they stand, like light upon the mountains. The only question is whether we can rise to them. And it is the same with all the greatest births of imagination—চিরন্তনকে স্পর্শ করতে না পারলে সভ্যতা সৃষ্টি করা যায় না। কেননা, সভ্যতা 'ভ্যালু'র ব্যাপার, আজ 'নিউভ্যালু' বলে কোনো চিজ নেই। জীবনে সোনা ফলাতে হলে প্রগতিকে চলতে হবে সভ্যতার দিকে মুখ করে, নইলে তার কাছ থেকে বড়কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজকাল প্রগতি কথাটা যত্রতত্র শুনতে পাওয়া গেলেও সভ্যতা কথাটা একরকম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। লোকেরা কেবল প্রগতি-প্রগতি করে, সভ্যতার নামটিও কেউ মুখে আনে না।

অনেকে সংস্কারমুক্তিকেই সংস্কৃতি মনে করে, উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না। কিন্তু তা সত্য নয়। সংস্কারমুক্তি সংস্কৃতির একটি শর্ত মাত্র। তাও অনিবার্য শর্ত নয়। অনিবার্য শর্ত হচ্ছে মূল্যবোধ। সংস্কার-মুক্তি ছাড়াও সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি অসম্ভব। মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তির চেয়ে কুসংস্কারও ভালো। শিশ্নোদর-পরায়ণতার মতো মন্দ সংস্কার আর কী হতে পারে? অর্থগৃধ্নুতাও তাই—কিন্তু এসব মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তিরই ফল। তাই শুধু সংস্কারমুক্তির ওপরে আস্থা স্থাপন করে থাকা যায় না। আরো কিছু দরকার। কামের চেয়ে প্রেম বড়, ভোগের চেয়ে উপভোগ—এ-সংস্কার না জন্মালে সংস্কৃতি হয় না। সূক্ষ্ম জীবনের প্রতি টান সংস্কৃতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তির টান সে-দিকে নয়, তা স্থূল জীবনেরই ভক্ত।

সংক্ষেপে সুন্দর করে, কবিতার মতো করে বলতে গেলে সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; কাব্যপাঠের মারফতে, ফুলের ফোটায়, নদীর ধাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায় বাঁচা; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা, বিরহীর নয়নজলে, মহতের জীবনদানে বাঁচা; গল্পকাহিনীর মারফতে, নরনারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা; ভ্রমণকাহিনীর মারফতে, বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের

দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।

সংস্কৃতিবান মানুষ সমাজের কল্যাণ কামনা করে এবং সেজন্য প্রাণপাত করতেও প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি চায় সে নিজের জীবনে সোনা ফলাতে। কেননা, সেখানে তার অবাধ অধিকার। তাই জগৎকে মেরামত করার চেয়ে নিজেকে শোধরানোর দিকেই তার অধিক ঝোঁক। তার সমুখ দিয়ে কে যেন সর্বদা গান গেয়ে যায় :

মন তুমি কৃষি-কাজ জানো না,
এমন মানব-জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

জীবনে সোনা ফলাতে হলে যে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব-মুক্ত হয়ে বিচিত্র জীবনধারণার সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া—নিজেকে বিশ্বের পানে মেলে ধরা, সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ করে রাখা নয়। কবির যে প্রার্থনা—'যুক্ত করহে সবার সঙ্গে, মুক্ত করহে বন্ধ'—তাতে সংস্কৃতিকামনাই ব্যক্ত হয়েছে। সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে মুক্তি; সকলের থেকে আলাদা হয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে, কূর্মের মতো আত্মগত হয়ে থাকা মুক্তি নয়—বন্ধন। 'জীবনে জীবন যোগ করা, নহিলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা', এই উক্তিটিও একই কামনার অভিব্যক্তি। পার্থক্য কেবল, ওখানে বাঁধনটা চাওয়া হয়েছে নিজের দিকে তাকিয়ে এবং নিজের জন্য, এখানে সকলের দিকে তাকিয়ে এবং সকলের জন্য। বাঁধন, বাঁধন, বাঁধন। সকলের সঙ্গে বাঁধন পরাতেই সমৃদ্ধি, 'ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন ঝলমল প্রাণ করিস যাপন'—শিথিল বাঁধন না হলে 'ঝলমল প্রাণ' লাভ করা যায় না। আর ঝলমল প্রাণ লাভ করাই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য।

শিথিল বাঁধনের অন্তরায় বলেই সংস্কৃতিকামীরা উগ্র জাতীয়তাকে এত ভয় করে। সব দেশে তাদের যে-ঘরটি রয়েছে, সেই ঘরটি তারা খুঁজে নিতে চায়। সকল দেশের, সকল জাতির, সকল কালের লোকই তাদের আত্মীয়। তারা বিশ্বনাগরিক; অনাত্মীয়তা, মানুষকে আপন না-জানা, ধর্ম বা মতবাদের বিভিন্নতার জন্য মানুষকে পর ভাবা সংস্কৃতির মনঃপূত নয়। কেননা, সংস্কৃতি মানেই অহমিকামুক্তি। অহমিকার গুমটভরা অন্ধকারে সংস্কৃতিকামীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। অহঙ্কার পতনের মূল কি না তা সে বলতে পারে না, কিন্তু তা-যে আনন্দের অন্তরায় সে-সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। অহঙ্কারী হওয়ার মানে নিজের চারদিকে বেড়া দিয়ে মানুষকে পর করা, আর মানুষকে পর করা মানে আনন্দকে পর করা। মানুষে-মানুষে মিলনেই আনন্দের জন্ম, বিরোধে নয়। বিরোধ আনন্দের শত্রু।

সংস্কৃতিসাধনা মানে ripe হওয়ার সাধনা। সেজন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রেমের। সংস্কৃতিবান হওয়ার মানে প্রেমবান হওয়া। প্রেমের তাগিদে বিচিত্র জীবনধারায় যে স্নাত হয়নি সে তো অসংস্কৃত। তার গায়ে প্রাকৃত জীবনের কটুগন্ধ লেগে রয়েছে; তা অসহ্য। 'সবার পরশে-পবিত্র করা তীর্থ-নীরে' স্নাত না হলে সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না।

মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার

পেরিক্লিসীয় এথেন্স্, রিনেসাঁসের ইটালি ও অষ্টাদশ শতকের ফরাসিদেশ এই সভ্যতাত্রয়ের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব। এই দুই বৈশিষ্ট্য-যে সবসময় আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে তা নয়, প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। যুক্তিবিচারদৃঢ় মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার—প্রতি সভ্যতায়ই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এখানে প্রশ্ন হবে : মূল্যবোধ কাকে বলে, আর যুক্তিবিচার জিনিসটাই বা কী?—নিকটবর্তী স্থূল সুখের চেয়ে দূরবর্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চেয়ে সৌন্দর্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দপ্রদ সুকুমারবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ক্ষতি স্বীকার করতে শেখা—এসবই মূল্যবোধের লক্ষণ; আর এ সকলের অভাবই মূল্যবোধের অভাব। যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব বলতে বোঝায় জীবনের সকল ব্যাপারকে বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার প্রবণতা। যুক্তিবিচার সকলের ভেতরেই কিছু-না-কিছু থাকে, কিন্তু এই সাধারণভাবে থাকা নয়, বিশেষ ও ব্যাপকভাবে থাকার কথাই বলা হচ্ছে। এ যেন যুক্তিবিচারের পূজা, অর্থাৎ তার আদেশ-পালন, কার্যসিদ্ধির জন্য তার নামমাত্র ব্যবহার নয়। নিরঞ্জন শুভ্রবুদ্ধিই যুক্তিবিচার; স্বার্থের দাগ-লাগা বুদ্ধিকে যুক্তিবিচারের সম্মান দেওয়া যায় না। তখন সে আর প্রভু নয়, গোলাম—আমাদের স্বার্থের মোট বয়ে বেড়ানো তার কাজ। সচরাচর আমরা যে-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকি সে এই স্বার্থের মোটবওয়া গোলামবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।

বুদ্ধি কী করে স্বার্থকলঙ্কিত হয়ে তার নিরঞ্জনত্ব হারিয়ে বসে, যত্রতত্রই তার নজির পাওয়া যায়—সেজন্য বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। তথাপি একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। সেদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ধর্ম, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করছিলুম। কথায় কথায় একজন বলে উঠলেন : আরে ছেঃ! হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা আর তুলো না, তা কখনো সম্ভব হতে পারে না। যারা আমাদের এতটা অবজ্ঞা করে যে, আমাদের নামগুলো পর্যন্ত শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে কি লিখতে পারে না, তাদের সঙ্গে মিল হতে পারে কী করে? অথচ দেখ না, আমরা কত সহজে তাদের নামগুলি, শুধু তাই নয়, তাদের দেবতাদের নামগুলি পর্যন্ত, লিখে যেতে পারি—কোথাও একটুকু বানান ভুল না করে।—উপস্থিত সকলেই কথাটায় সায় দিলেন, আমিও বাদ রইলুম না। কিন্তু নির্জনে চিন্তা করতে গিয়ে যখন নিরঞ্জন শুভ্রবুদ্ধির আলোক লাভ করলুম তখন বুঝতে পারলুম ভুল হয়ে গেছে, না-ভেবেচিন্তে তখন কথাটায় সায় দেওয়া ঠিক হয়নি। মুসলমান-যে হিন্দুর নামগুলো

যথাযথ বানান ও উচ্চারণ করতে পারে, সে মুসলমানের গুণ নয়; কেননা বাংলা মুসলমানের মাতৃভাষা, আর হিন্দুর নামকরণ সে ভাষাতেই হয়ে থাকে; আর হিন্দু-যে মুসলমানের নামগুলো বিশুদ্ধভাবে বানান ও উচ্চারণ করতে পারে না, সে হিন্দুর দোষ নয়—কেননা মুসলমানের নামকরণ সাধারণত যে-দুটি ভাষায় হয়ে থাকে, সেই আরবি ও ফারসি ভাষা হিন্দুর মাতৃভাষা নয়। (হিন্দুর কথা না হয় থাক, শতকরা ক'জন মুসলমান মুসলমানের নামগুলি—সেসবের মধ্যে নিজেদেরগুলোও অন্তর্ভুক্ত—ঠিকমতো বানান ও উচ্চারণ করতে পারে, তা ভেবে দেখবার বিষয়।) অবশ্য ইচ্ছাকৃত ত্রুটি যে নেই তা নয়, কিন্তু বেশিরভাগই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি।

পরদিন কথাটা বন্ধুদের বললুম, কিন্তু তাদের অপ্রসন্নতাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি দেখে ও-সম্বন্ধে অধিক আলাপ করা আর সঙ্গত মনে হল না। সত্যের জন্য যাদের উন্মুখতা নেই, তাদের সত্য জানানোর চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তর্ক করে লাভ নেই, তাতে খাম্‌কা মন বিগড়ে যায় এবং শেষপর্যন্ত সত্যকে পাওয়ার আগ্রহ তলিয়ে গিয়ে জয়ের ইচ্ছাই বড় হয়ে ওঠে। এরূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধির জগৎ ছেড়ে প্রাণের জগতে নেমে আসা স্বাস্থ্যকর। আমিও তাই করলুম। তর্ক ছেড়ে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা শুরু করলুম।

যাক, যা বলছিলাম। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি তথা যুক্তিতর্ক নয়, উদারবুদ্ধি তথা যুক্তিবিচার সভ্যতা, আর তার অভাবই বর্বরতা। তাই বুদ্ধিকে নিজের কাজে না লাগিয়ে নিজেকে বুদ্ধির কাজে লাগানো দরকার। নইলে বুদ্ধির শুভ্রতা নষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও অবনতি ঘটে। প্রয়োগভেদে বুদ্ধির মূল্যভেদ হয়ে থাকে। একই বুদ্ধি সৌন্দর্য, প্রেম, আনন্দ ইত্যাদি সুকুমার-বৃত্তির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে মনীষার উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, আবার মদ্‌ মাৎসর্য, লোভ ইত্যাদি অসুন্দর বৃত্তির সংস্পর্শে এসে চালাকির নিম্নস্তরে নেমে আসে। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর বুদ্ধিকে সাহিত্য, শিল্প ও বিশ্বচিন্তায় না লাগিয়ে ব্যারিস্টারি কাজে লাগাতেন তো তাঁর বুদ্ধির উন্নয়ন না হয়ে অবনতিই ঘটত এবং তিনিও মনীষার মর্যাদা না পেয়ে একজন সুচতুর আইনজীবীর সম্মান লাভ করতেন। তাহলে বলতে পারা যায়, মানুষের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বুদ্ধির প্রাচুর্য নয়, উৎকর্ষই গণনার বিষয়। কার কী পরিমাণ বুদ্ধি আছে, তা দেখে লাভ নেই; কে কতখানি বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করেছে, তাই দেখবার বিষয়। বুদ্ধির অপ্রতুলতা কি প্রাচুর্যের জন্য মানুষের নিন্দা কি প্রশংসা করা ঠিক নয়। কেননা তা প্রকৃতির দান, আর প্রকৃতির খেয়ালের ওপর কারো হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করলেই বুদ্ধির পরিমাণ বাড়াতে পারিনে, কিন্তু উৎকর্ষ বাড়াতে পারি। শিক্ষার কাজই হচ্ছে বুদ্ধির উৎকর্ষবৃদ্ধি, পরিমাণবৃদ্ধি নয়।

বুদ্ধিজীবীরা-যে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা পান না তার হেতুও এখানে। বুদ্ধির প্রাচুর্যের দিক দিয়ে তাঁরা যে কারো চেয়ে কম যান তা নয়—হয়তো অনেক ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকদের বহু পশ্চাতেও ফেলে যান; কিন্তু সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে চলেন না বলে উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁরা অনেক পেছনে পড়ে থাকেন। তাই প্রচুর বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মনীষা আখ্যা তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। কেননা, সংস্কৃত-সুন্দর বুদ্ধিই মনীষা, অসংস্কৃত অসুন্দর বুদ্ধি মনীষা নয়—চাতুর্য। উভয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটি নোংরামিমুক্ত, নির্মল আত্মার সরোবরে ডুব দিয়ে যেন সুন্দর

হয়ে উঠেছে; আরেকটা নোংরা, কুশ্রী—ন্যক্কারজনকতার দরুন তার দিকে তাকানোই যায় না। অসংস্কৃত, অসুন্দর বুদ্ধিকে সংস্কৃত ও সুন্দর করে তোলা শিক্ষার একটি বড় উদ্দেশ্য। না, ভুল বলেছি, শিক্ষার মানেই তাই। বিবিধ জ্ঞানানুশীলন সত্ত্বেও বুদ্ধির সংস্কার না হলে শিক্ষা সার্থক হয়েছে বলা যায় না। বুদ্ধির সংস্কার মানে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা; আর সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রেম প্রভৃতির সুকুমারবৃত্তির সংস্পর্শে এসেই মূল্যবোধের উন্মেষ হয়।

মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব সামাজিক নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল। নিরাপত্তার অভাবহেতু অসভ্যদের ভেবেচিন্তে চলার সময় নেই। পরিবার ও আত্মরক্ষার জন্য সকল সময়ই তাদের সহজপ্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। সহজপ্রবৃত্তি যা আদেশ করে, তাই তারা নিরুপায়ের মতো 'যো হুকুম' বলে তামিল করে—সহজপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে যে মন তার কোনো খবরই রাখে না। তাই প্রয়োজনের কারাগারে তারা আবদ্ধ—অপ্রয়োজনের মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ করতে অক্ষম। একটি সুন্দর সনেট-যে একটি সুস্বাদু ভাজা ডিমের চেয়ে মূল্যবান, এ ধারণা অসভ্যদের নেই। শুধু অসভ্যদের কথাই বা বলি কেন, নিম্নস্তরের সভ্যদের মধ্যেও এ ধারণার অভাব। যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে সুকুমারবিদ্যা শ্রেষ্ঠ—অন্নবস্ত্রের চিন্তায় অস্থির মানুষকে এ-কথা বুঝাতে যাওয়া বাতুলতা। প্রয়োজনের নিগড়েই যাকে সারাক্ষণ আবদ্ধ থাকতে হয়, প্রয়োজনাতিরিক্তের প্রতি নজর দেওয়ার তার সময় কোথায়? কাজ নিয়েই তার সময় কাটে, লীলারস সম্ভোগের অবসর জোটে না। তাই সভ্যতাসম্মত মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সভ্যতার জন্য অবসরের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত, আর নিরাপত্তা অবসরের লালয়িত্রী। যেখানে নিরাপত্তা নেই সেখানে মূল্যবোধ ও বিচারশীলতা নেই, আর মূল্যবোধ ও বিচারশীলতার অভাব মানে—সুসভ্যতার অভাব।

নিরাপত্তা সভ্যতার সহায়। কিন্তু তাই বলে নিরাপত্তা অথবা তার উপায়কে সভ্যতা বলা যায় না। এই-যে আমি নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে রচনা লিখছি, এর পেছনে রয়েছে পুলিশের অস্তিত্ব। পুলিশ না থাকলে তা কখনো সম্ভব হত না—নিয়ত আমাকে পরিবার ও আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত থাকতে হত। কিন্তু তাই বলে পুলিশ সভ্যতা নয়, সভ্যতার রক্ষক মাত্র। গোলাপের সঙ্গে কাঁটার যে-সম্বন্ধ সভ্যতার সঙ্গেও পুলিশের সেই সম্বন্ধ—উভয়ই আত্মরক্ষার উপায়, আত্মবিকাশের উপায় নয়। তবু সঙ্গিন-বন্দুক, কামান-বারুদকে অনেকে সভ্যতা বলে ভুল করে।

প্রকৃতিবিজয়ের ফলে যা আসে তা সভ্যতা নয়, আত্মমার্জিতির ফলে যা পাওয়া যায়, তাই সভ্যতা। প্রকৃতিবিজয়ের মত্ততাহেতু মানুষ আত্মমার্জনার কথা একরকম ভুলেই যাচ্ছে। তাই মনে হয়, প্রকৃতিবিজয় মানুষের জীবনে আশীর্বাদের মতো না এসে মহা অভিশাপের মতোই আবির্ভূত হয়েছে। বিজিতের চরণে সেলাম ঠুকে বিজেতা অসহায়ের মতো দাসখত দিতে দ্বিধা করেনি। ফলে মূল্যবোধ তিরোহিত হল, বিচারবুদ্ধি স্বার্থসিদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোনো বড় কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ পেল না। অতএব বলতে ইচ্ছে হয়, প্রকৃতিবিজয় না হলেই যেন ভালো হত; কেননা, তাহলে বিজিগীষু মানুষ স্থূল বস্তুজগতের পরিবর্তে অন্যকোনো সূক্ষ্মজগৎ জয় করবার প্রেরণা লাভ করত এবং ধ্যান-কল্পনার পূজা করে ইতরতামুক্ত হতে পারত।

মনে রাখা দরকার, যা দিয়ে বাঁচা যায় তা সভ্যতা নয়; যার জন্য বাঁচা হয়, তা-ই সভ্যতা। তাই ভাত-কাপড়ের যোগাড়কে সভ্যতা না বলে সৌন্দর্য ও আনন্দের আয়োজনকেই সভ্যতা বলা সঙ্গত। মূল্যবোধের অভাবে মানুষ এ-কথা উপলব্ধি করতে পারছে না বলে ক্রমবিকাশ ব্যাহত হচ্ছে—মানুষ যে তিমিরে সে-তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। উপায়কে উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করার এ-ই শাস্তি। এই শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। মূল্যবোধের সচেতনতা মানে সৌন্দর্য ও আনন্দ সম্বন্ধে সচেতনতা।

কিন্তু আনন্দ আজ অবজ্ঞাত, আরাম তার স্থান দখল করে বসেছে। আরামের আয়োজনকেই আনন্দের আয়োজন মনে করে লোকে ভুল করছে। ও দুবস্তু-যে এক চিজ নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস; সে-সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে না পারলে সমূহ ক্ষতি। আনন্দ মানসিক ব্যাপার, আরাম শারীরিক। আরামের জয়ে শরীরেরই জয় হচ্ছে; মন বেচারি কোণঠাসা হয়ে কোনোপ্রকারে দিনগুজরান করছে মাত্র। তার দিন ফিরিয়ে আনতে না পারলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ, সংগ্রাম আরামের জন্যই হয়ে থাকে, আনন্দের জন্য হয় না। আনন্দ একান্তভাবে বস্তুনির্ভর নয়, আরাম একান্তভাবে বস্তুনির্ভর। আর বস্তুর জন্যই যুদ্ধ। তাই পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করতে হলে আরামের চেয়ে আনন্দ তথা শরীরের চেয়ে মনকে বড় করে তোলা দরকার। নইলে যুদ্ধবিরতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দৃষ্টিভঙ্গিই ইষ্টানিষ্টের মূল। তাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তথা মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি না-রেখে সমাজপরিবর্তনের চেষ্টা করলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মূল্যবোধ লক্ষ্য, সমাজপরিবর্তন উপলক্ষ, এ-কথাটা ভালো করে মনে রাখা চাই। নইলে সমাজপরিবর্তন আমাদের বেশিদূর নিয়ে যেতে পারবে না। শেষপর্যন্ত রাজতোরণে এসেও রাজার দেখা না-পেয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে। যাঁরা বলেন, সমাজপরিবর্তন হলে মূল্যবোধ আপনাআপনি সৃষ্টি হবে, সেজন্য পূর্ব থেকে সচেতনতা বা প্রয়াসের প্রয়োজন নেই, তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনে এইজন্য যে, মনুষ্যত্বকে তাঁরা যতটা সস্তা মনে করেন আসলে তা ততটা সস্তা তথা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সেজন্য সদাজাগৃতির প্রয়োজন; আর মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য ও আনন্দ সম্বন্ধে সচেতনতা সদাজাগৃতির লক্ষণ। মনুষ্যত্বকে যাঁরা সমাজপরিবর্তনের by product মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

মূল্যবোধের অভাবের দরুন আমরা আসলকে নকল, নকলকে আসল, লক্ষ্যকে উপায়, উপায়কে লক্ষ্য মনে করছি। তাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। কোন্ জিনিসের উপর কোন্ জিনিস স্থাপিত হওয়া দরকার, কোন্‌টা জীবনের পাদপীঠ, কোন্‌টা শিরোপা, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলে জীবনকে শিল্পের মতো ধাপে ধাপে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অন্নবস্ত্রের আয়োজন আনন্দ-উপভোগের উপায় না হয়ে আনন্দ উপভোগই অন্নবস্ত্র উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকেরা যখন সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তখন বিজ্ঞের মতো বলে থাকে : আরে একটু আনন্দ-উপভোগ না করলে কর্ম-উদ্যম বজায় থাকবে কী করে? আর কর্ম-উদ্যম বজায় না থাকলে আমরা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকব কোন উপায়ে?—যেন কর্ম-উদ্যম বজায় রাখবার জন্যই আনন্দের

প্রয়োজন, তার নিজস্ব কোনো সার্থকতা নেই। উপায়কে লক্ষ্য আর লক্ষ্যকে উপায় করে দেখার এ চমৎকার নিদর্শন। বিজ্ঞজনরা 'আনন্দ' কথাটা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু আসলে তারা যা বুঝাতে চায় তা হচ্ছে 'ফূর্তি'। জীবনের গভীরতার সঙ্গে পরিচয় নেই বলে আনন্দ কী বস্তু তা তারা ধারণা করতেই পারে না। পারলে তাকে উপায় না করে লক্ষ্যই করত।

বহির্জীবনের চেয়ে অন্তরজীবন বড়, এ-ই মূল্যবোধের শিক্ষা। তাই বাইরের জন্য ভেতরকে, স্থূলের জন্য সূক্ষ্মকে বলি দেওয়া মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের মনঃপূত নয়। সুকুমারবৃত্তির বিকাশেই জীবনের চরিতার্থতা, স্থূল ভোগে নয়—এই বিশ্বাস আছে বলে সূক্ষ্ম উপভোগের দিকেই তার ঝোঁক। প্রয়োজনের দাবির চেয়ে অপ্রয়োজনের দাবিই তার কাছে বড়। কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনের দাবিও সে অস্বীকার করে না। দেহের জন্য আত্মা বিক্রয় যেমন তার কাছে মহাঅপরাধ তেমনি প্রয়োজনবোধে জীবনধারণের জন্য আত্মা বিক্রয় না-করাও মহাপাতক। বেঁচে থাকার দাবিই তার কাছে সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জীবনধারণের জন্য আত্মা বিক্রয় সমর্থন করলেও সাংসারিক উন্নতির জন্য আত্মা বিক্রয় সে কোনোদিন সমর্থন করে না। সে জানে সংস্কৃতির যদি কোনো শত্রু থাকে তো সে এই সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা। কেননা, সংস্কৃতি মানে সুকুমারবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষসাধন, আর সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা শিলাবৃষ্টির মতো সুকুমারবৃত্তির বিকাশ-উন্মুখ মুকুলগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়। আগে জীবন, পরে সংস্কৃতি—এ-কথা সে মানে; কিন্তু আগে সাংসারিক উন্নতি, পরে সংস্কৃতি—এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা সংস্কৃতি-কামনাকে এমনভাবে দাবিয়ে রাখে যে, তা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না—আলো-হাওয়ার স্পর্শবঞ্চিত ফুলের মতো অবচেতনের অন্ধকারে আবদ্ধ থেকে তা ধীরে ধীরে শুকিয়ে ঝরে যায়। লক্ষ্মীসরস্বতীর প্রাবাদিক কোন্দল ভিত্তিহীন হয়। ধন আর মন একসঙ্গে যায় না। ধনকে যে চেয়েছে মনকে সে পর করেছে, আর মনকে যে কামনা করেছে ধন তার দিকে ফিরেও তাকায়নি—এ তো সচরাচরই দেখতে পাওয়া যায়। তাই লক্ষ্মীর ধনভাণ্ডারকে সমভাবে বেঁটে দেওয়ার উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। অতিভোগ ও ভোগহীনতার পাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার এ-ই একমাত্র পথ। কিন্তু তা করতে হবে সরস্বতীর প্রতি দৃষ্টি রেখে, লক্ষ্মীর দিকে নজর রেখে নয়। ধনসাম্যের উদ্দেশ্য হোক সার্বজনীন সরস্বতী পূজা : তবেই তা মানুষের সত্যিকার মুক্তির বাহন হতে পারবে। বলাবাহুল্য, লক্ষ্মী মানে কল্যাণ আর সরস্বতী মানে সৌন্দর্য। কল্যাণের জগৎ থেকে সৌন্দর্যের জগতে গমন প্রাণের পক্ষে অধিরোহণই, অবরোহণ নয়। আর কল্যাণের জগতে থেকে যাওয়াকে অবরোহণ বলা গেলেও অধিরোহণ বলা যায় না। তাই কল্যাণকে সৌন্দর্যের বাহন করে তোলা দরকার, নইলে প্রগতি একটা তাৎপর্যহীন বাত-কি-বাত হয়ে দাঁড়ায়।

মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে দুটি কারণে। প্রথমত আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হতে চলেছে, আর আমেরিকা জাত হিসেবে স্থূলবুদ্ধি। গভীর জীবনের স্বাদ তারা পেতে চায় না। তারা যা চায় তা আনন্দ নয়, স্ফূর্তি। ভোগেই তারা পটু, উপভোগ নয়। ছন্দো ও সুষমাময় জীবন তারা কল্পনাই করতে পারে না। সমস্ত দিন ব্যাঙ্কের লেজারের উপরে ঝুঁকে পড়ে হিসাব মিলানো আর সন্ধ্যাবেলা সুরামত্ত হয়ে সারাদিনের পরিশ্রমজনিত দুঃখ

লাঘবের প্রয়াস—এ-ই তাদের কাছে 'জীবন'। কোনোপ্রকার গভীর অনুভূতি কি সুন্দর কল্পনা তাদের জীবনে সাড়া জাগাতে পারে না। সুখের আত্যন্তিক প্রয়াস-যে সুখের অন্তরায়, এ-ধারণা তাদের নেই। অর্থকামনার চাকার নিচে জীবনের সুকুমারবৃত্তিগুলি মাড়িয়ে দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই আমেরিকা সভ্য হয়েই রইল, সুসভ্য হতে পারলে না। অবশ্য এসব কথা বলবার অধিকার আমার নেই এবং বলতুমও না যদি বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ চিন্তাশীলদের রচনার সঙ্গে পরিচয় না ঘটত। রাসেল তো মাঝে মাঝে আমেরিকার প্রতি রাগে লাল হয়ে ওঠেন। তাঁর দুঃখ এই যে, আমেরিকার মনোবৃত্তি সমগ্র পৃথিবীর মনোবৃত্তি হতে চলেছে—অচিরে সমস্ত দেশ আমেরিকার মতো আনন্দবোধহীন ও স্থূলবুদ্ধি হয়ে পড়বে, এমনকি, এমন যে তাঁর প্রিয় দেশ চীন—যা তাঁর মতে চিন্তার স্বাধীনতা ও জীবনবোধের দেশ—তাও বাদ পড়বে না। কেননা, সকল দেশই আধুনিক হতে চলেছে, আর আধুনিক হওয়া মানে মার্কিন হওয়া। মূল্যবোধের অভাবের দরুন আমেরিকার প্রভাবে পৃথিবীর কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। তাই সাবধান হওয়া দরকার।

আত্মিক ব্যাপারে অতৃপ্তি ভালো, তা জানার সীমানা ডিঙিয়ে অজানার রাজ্যে উঁকি দেওয়ার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে অতৃপ্তিবোধ মারাত্মক, তা আত্মার সৃজনীশক্তিকে পঙ্গু ও অথর্ব করে রাখে—তাকে স্বচ্ছন্দগতি হতে দেয় না। A dissatisfied Socrates is thousand times better than a satisfied pig—এই উক্তিতে যে-অতৃপ্তির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তা এই আত্মিক অতৃপ্তি—divine discontent—বস্তুগত অতৃপ্তি নয়। আত্মিক অতৃপ্তি একপ্রকারের সুখ—পরমবেদনা, বস্তুগত অতৃপ্তি নির্জলা দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় না, ব্যাহত করে। তাই তা পরিত্যাজ্য। A happy man is he who knows what he wants. বস্তুত কী চাই, তা ভালো করে জানা থাকলে মানুষ সহজেই সুখী হতে পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে, আমেরিকানদের তথা আধুনিকদের অভাববোধের অন্ত নেই। তারা কেবলই 'আরো চাই' 'আরো চাই' করছে। কী তাদের দরকার, কী না হলেও চলে, তা জানা নেই বলে সবকিছুই তারা চায়, আর সবকিছু চাওয়া মানে জীবনে দুঃখকে দাওয়াত করা। অভাবের মাত্রা বাড়িয়ে চলা আর দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে চলা এক কথা। বস্তুসাধনার উদ্দেশ্য বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া। প্রবল বস্তুসাধনা সত্ত্বেও আমেরিকা বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছে না এই উদগ্র ক্ষুধার জন্য। 'আরো চাই' 'আরো চাই' মনোবৃত্তি তাকে উন্নত ও সুন্দর জীবনের স্বাদ পেতে দিচ্ছে না। অমৃতের কামনা নেই বলে সে কেবলই বস্তুর দাস হয়ে পড়ছে। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য This far and no further—এই পর্যন্তই, এর বেশি নয়—এই বাণীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে জাতি বা দেশ শুধু মুখে উচ্চারণ করে নয়; জীবনে রূপায়িত করে এই বাণী প্রচার করবে, তার দ্বারাই জগতের কল্যাণ সাধিত হবে। অতিভোগ ও ভোগহীনতার বর্বরতা থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা তারই আছে। কিন্তু একটি কথা, তারও মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত আমরা নতুন রাষ্ট্রের অধিবাসী আর নতুন রাষ্ট্র ও যুদ্ধকালীন রাষ্ট্র মূল্যবোধকে তলিয়ে দিয়ে প্রয়োজনবোধকে ওপরে তুলে ধরে। যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের

দাবিকে ভয়ের চোখেই দেখা হয়। তাই তাকে দমিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের জন্য জানকোরবানের বাণীকে লোভনীয় করে তুলে ধরা হয়। বাকচাতুর্যের দ্বারা বীরত্ববোধ ও উগ্র স্বদেশপ্রেমের কাছে আবেদন জানানো হয় বলে বুদ্ধিবৃত্তি সহজেই কাবু হয়ে পড়ে— সমালোচনাশক্তি একেবারেই পঙ্গু হয়ে যায়। আরে ছেঃ ছেঃ নিজের জীবনটা ভোগ করতে চাও? নিজের জীবন তো সকলেই ভোগ করে; তাতে কী মহত্ত্ব আছে? মহত্ত্ব রয়েছে জীবন দেওয়ায়। যদি জাতির জন্য, ধর্মের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য জীবন দিতে পারো তো বুঝব তোমার ধমনিতে দামি রক্ত প্রবাহিত, নইলে আর তোমার জীবনের মূল্য কী? ব্যস্ তরুণ সম্প্রদায়কে বোকা বানাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মতো সমরানলে পুড়ে মরবার জন্য অমনি তারা দলে দলে ছুটে চলবে। তাদের এই প্রাণদানে জগতের কতটুকু লাভ হবে, তা একবারও ভেবে দেখবে না। সত্যি বলতে কি, যুদ্ধ জিনিসটা তরুণ সম্প্রদায়ের বোকামির উপর নির্ভর করেই আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। আবেগের প্রাবল্য কমিয়ে দিয়ে তারা যদি একটুখানি সচেতনবুদ্ধির চর্চা করত, তবে তা বহুপূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যুদ্ধে, যে তরুণদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি–আবেগের প্রাবল্যের দরুন তারা তা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না।

যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রের এই চিত্র। নতুন রাষ্ট্রের চিত্রও অনেকটা এরই মতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকলে এখানেও যুদ্ধের বাণী বড় হয়ে ওঠে, নইলে কর্মের বাণী প্রাধান্য লাভ করে। কর্ম করো, কর্ম করো—হে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ। নিজের ভোগের দিকে না–তাকিয়ে অনবরত রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাজ করে চলো। ওই–যে গুবরেপোকা, সেও তো নিজের জন্যই জীবনধারণ করছে। তাহলে তার জীবনে আর তোমাদের জীবনে পার্থক্য কোথায়? নিঃস্বার্থ কর্মই মনুষ্যত্ব। অতএব, স্বার্থলেশহীন হয়ে কাজ করে যাও, স্বার্থের কথা ভেবে না–হক জীবনকে কলঙ্কিত কোরো না।—কর্মের বাণীর সঙ্গে একটা মতবাদ বা আদর্শও মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মানুষকে আত্মচেতনাহীন করে তুলবার উদ্দেশ্যে। তখন পুতুলনাচের পুতুলের মতো তাকে যদৃচ্ছা চালনা করা সহজ হয়ে পড়ে।

নতুন রাষ্ট্রের সবচাইতে বড় ত্রুটি এই যে, তাতে সুকুমারবিদ্যার চেয়ে কেজোবিদ্যা প্রাধান্য লাভ করে, আর কেজোবিদ্যা ধীরে ধীরে সুকুমারবৃত্তির ধারগুলি বেমালুম ভোঁতা করে দিয়ে মানুষকে অনুভূতিহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত করে। কেজোবিদ্যার বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছুই নেই, তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে যদি সুকুমারবিদ্যাকে গলা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তার গদিটি দখল করে বসতে চায় তো আপত্তি না–জানালে অন্যায় করা হবে। শিক্ষার একটা বড় উদ্দেশ্য জীবন–উপভোগের ক্ষমতাবর্ধন। কেজোবিদ্যার দাবি বড় হয়ে উঠলে সে উদ্দেশ্যটি চাপা পড়ে যায়—শিক্ষা জীবনার্জনের উপায় না হয়ে জীবিকা উপার্জনের উপায় হয়ে ওঠে। ফলে সূক্ষ্ম উপভোগের অভাবে বর্বরতার সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না—মানুষ আত্মিক জগতে উন্নীত হয়ে যেতে পারে—বস্তুর সে ক্ষমতা নেই—প্রয়োজনের তাগিদে নতুন রাষ্ট্রের কর্তারা সে–কথাটা ভুলে যান। তাই নতুন রাষ্ট্রে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকার বিশেষ প্রয়োজন।

চূড়ার দিকে নজর রেখেই গোড়ার কথা ভাবা দরকার, নইলে গোড়াতেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়—চূড়ায় ওঠা আর সম্ভব হয় না। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে নজর রেখেই রাষ্ট্র গড়ে তোলা দরকার, নইলে শেষপর্যন্ত তা মানুষের মুক্তির উপায় না হয়ে বন্ধনের রজ্জু হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রের পুতুলপূজার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি। মানুষের বিকাশের জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। অতএব, লক্ষ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়া দরকার। নতুবা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। মানুষের মুক্তির জন্যই রাষ্ট্র আর মুক্তি মানে বস্তুর বন্ধনমুক্ত হয়ে সৌন্দর্য ও আনন্দলোকে উন্নয়ন। মানুষ ব্যক্তি হিসেবে অনেকদূর এগিয়ে গেছে—সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জগতে তার অভিযান চলেছে, কিন্তু জাতি হিসেবে সে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। রাষ্ট্রের কাজ বস্তুর বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে মানুষের ক্রমবিকাশে সহায়তা করা। এ ব্যাপারে কেজোবিদ্যার দান অপরিসীম। কিন্তু মুক্তির মানে কেবল বস্তুর থেকে নিষ্কৃতি নয়, আর কিছু। বস্তুর বন্ধনমুক্ত হয়ে ধ্যানকল্পনার জগতে যেতে না-পারলে সত্যিকার মুক্তিলাভ হয় না। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে মানবমনের যে ক্রমিক উন্মোচন, তারই নাম মুক্তি। এ ব্যাপারে সুকুমারবিদ্যার একচেটে অধিকার, কেজোবিদ্যা এখানে দাঁত ফোটাতে পারে না। তাই সুকুমারবিদ্যার এত প্রয়োজন। সুকুমারবিদ্যাকে অবজ্ঞা করা আর মূল্যবোধহীনতার পরিচয় দেওয়া এক কথা।

যুক্তিবিচার আর মূল্যবোধে-যে খুব পার্থক্য আছে, তা নয়। মূল্যবোধকে যাচাই করে নেওয়ার পদ্ধতিই যুক্তিবিচার। একই বস্তু অনুভূতিলোকে একরূপ, বুদ্ধিলোকে অন্যরূপ লাভ করছে, এই যা প্রভেদ। কিন্তু উভয়েই মূলত এক। মূল্যবোধকে সংশ্লিষ্ট যুক্তিবিচার, আর যুক্তিবিচারকে বিশ্লিষ্ট মূল্যবোধ বললে ভুল বলা হবে না। তাই যুক্তিবিচার সম্বন্ধে আর বেশিকিছু বলা সঙ্গত মনে হল না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, জীবনমান নয়; মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারই জীবনসমৃদ্ধির পরিমাপক। এই দুই গুণের পরিচয় যিনি যতবেশি দিতে পেরেছেন, তিনি ততবেশি উন্নত বলে পরিগণিত হয়েছেন যুগে যুগে; কালে কালে মানুষ তাঁরই মহিমাকীর্তন করেছে ও করবে। তাই তাদের জয় কামনা করে আমি বক্তব্য সমাপ্ত করছি। যুক্তিবিচার আর মূল্যবোধ—এই দু'টি কথা আমাদের জপমন্ত্র হোক; তাহলেই আমরা বর্বরতামুক্ত হয়ে সুন্দর ও সুসভ্য হতে পারব—চাই কি, যাকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ দিব্যসত্তা, তার সঙ্গেও আমাদের মুলাকাত হয়ে যেতে পারে।

পরিশিষ্ট

মূল্যবোধ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হলেও কি মূল্যবান, কি মূল্যবান নয়—সে সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছুই বলা হয়নি—সামান্য ইঙ্গিত মাত্র করা হয়েছে। এখানে সে অভাবটুকু পূরণ করবার চেষ্টা করছি। প্রথমত বলা দরকার, মানবজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো ব্যাপারকেই মূল্যহীন বলা যায় না। তবে মূল্যের কমবেশ আছে। তাই মূল্যবোধের মানে

মূল্যের কমবেশ সম্বন্ধে ধারণা। সাধারণভাবে মন্তব্য করা যায় : প্রয়োজনীয় জিনিসের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যই বেশি। কেননা, প্রয়োজনীয় জিনিস দেহের তৃপ্তি মাত্র; আত্মার তৃপ্তি নয়—আত্মার তৃপ্তি অপ্রয়োজনীয় জিনিসে। তাই একটি সুস্বাদু ভাজা ডিমের চেয়ে একটি সনেটের মূল্য বেশি। এখন প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় এ–দুয়ের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কী করে? যা না–পেলে তীব্র দুঃখ, কিন্তু পেলে মামুলি সুখ, গভীর আনন্দ নয়, তা–ই প্রয়োজনীয়; আর যা না পেলে তেমন দুঃখ হয় না, কিন্তু পেলে গভীর আনন্দ, তা–ই অপ্রয়োজনীয়। নিচের দৃষ্টান্তগুলির দিকে নজর দিলেই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হবে। ভাত না–খেলে তীব্র দুঃখ অনুভূত হয়, কিন্তু খেলে গভীর আনন্দ পাওয়া যায় না। একটা সুন্দর সনেট না পড়লে দুঃখ নেই, কিন্তু পড়লে খুশিতে মন ভরে ওঠে। দৈনিক পত্রিকা না পড়লে দিনটা মাটি হল বলে মনে হয়, কিন্তু পড়লে তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। একটা ভালো সাহিত্যের বই না পড়লেও চলে, কিন্তু পড়লে মন আনন্দে নেচে ওঠে—জীবনকে সার্থক বলে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছে হয়। এমনি আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তা আর দেওয়া হল না। তাহলে দেখতে পাওয়া গেল, যা না হলে চলে না তা–ই কম মূল্যের, আর যা না হলেও চলে তা–ই বেশি মূল্যের। অথবা অন্যভাবে দেখতে গেলে, যা শারীরিক অথবা নিম্নস্তরের মনের ব্যাপার (যেমন দৈনিক পত্রিকা–পাঠ) তারই মূল্য কম, যা মানসিক তারই মূল্য বেশি। শরীর–ব্যাপার বলে কামের মূল্য কম, আত্মার ব্যাপার বলে প্রেমের মূল্য বেশি। তবে প্রেম বলে আলাদা কিছু বোধহয় নেই, কামই যখন আত্মার রঙ লেগে সুন্দর ও শালীন হয়ে ওঠে তখনই তা প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেম কামেরই উর্ধ্বমুখীন সুন্দর প্রকাশ। তাই জঠরের চেয়ে কাম বড়—Sex is more spiritual than belly. আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে কামের উর্ধ্বগতি আছে, জঠরের নেই। তাই কাম এত কাব্য–সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে, জঠর হয়নি। জঠর মানে ইতর ব্যাপার, তার কোনো সৌন্দর্য নেই। কেবল টিকে থাকবার জন্য তার প্রয়োজন। কিন্তু কাম ইতর ব্যাপার নয়, শ্রদ্ধেয় ব্যাপার। সৌন্দর্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মহত্ত্বের সঙ্গেও। শ্রদ্ধেয় ব্যাপার বলেই তার বেলা এত আঁটাআঁটি, এত সাবধানতা। পূজালয়ে প্রবেশ করতে হলে যে–শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠার প্রয়োজন, এখানেও তাই আবশ্যক।*

(এই নিবন্ধে জীবনের বাইরের কোনো ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। জীবনের ভেতরেই যে শ্রেষ্ঠ–নিকৃষ্ট, সুন্দর–অসুন্দর রয়েছে তারি প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) জীবনশিল্পের মানেই এই উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে সচেতনতা। জীবনশিল্পীরা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট উভয়কে মেনে নিয়ে জীবনকে শিল্পের মতো ধাপে ধাপে সাজিয়ে দেন। মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। প্রয়োজনের দিকটা প্রধান দিক হলেও যে শ্রেষ্ঠ দিক নয়, শ্রেষ্ঠ দিক অপ্রয়োজনের দিক, কেননা তাতেই মানুষের মুক্তি—এই বোধ না থাকলে সত্যকার জীবনশিল্পী হওয়া যায় না।

---

* বলা হয়েছে, জঠর ইতর ব্যাপার। তাই মানুষকে ইতরতামুক্ত করতে হলে জঠরের সমস্যার সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

সমাজশিল্প জীবনশিল্পের বুনিয়াদ। আর জীবনশিল্প মূল্যবোধেরই অভিব্যক্তি। দার্শনিক যাকে superstructure বলেছেন, তার গোড়ায়ও মূল্যবোধ। তাই তা অবহেলিত হওয়ার মতো জিনিস নয়। বরং superstructure-এর দিকে লক্ষ্য রেখেই main structure গড়ে তোলা দরকার। নইলে সমাজ-পরিবর্তন মানুষকে বেশিদূর এগিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। গ্রিসে superstructure (সৌন্দর্যজগৎ) প্রাধান্য লাভ করেছিল।* রিনেসাঁসের ইটালিতেও। কিন্তু তাদের main structure তথা কল্যাণের জগৎ ক্রটিবিহীন ছিল না। অনেক নিষ্ঠুরতা ও ব্যভিচারের কাহিনী তাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। অধুনা কল্যাণের জগৎটি যথাসম্ভব ক্রটিবিমুক্ত ও নিষ্কলুষ করে গড়ে তুলবার চেষ্টা চলেছে। সে ভালো কথা। কিন্তু superstructure-এর দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। কেননা, তা-ই সভ্যতা। আর সভ্যতা আপনাআপনি সৃষ্ট হয় না, তার জন্য বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের প্রয়োজন।**

---

* শিল্প ও জ্ঞানের জন্য যদি পৃথিবীতে কোনো জাতি বেঁচে থাকে, তবে তা গ্রিক জাতি। গ্রিসে প্রতি তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হয় ভাস্কর, নয় ভাস্করের সহকর্মী ছিল। আর্ট ও কালচার তাদের কাছে উপরি পাওনা ছিল না, ছিল জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই তারা চমৎকার সভ্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

** কয়েক বছর আগে ক্লাইভ বেলকে অনুসরণ করে বিভিন্ন পত্রিকায় আমি সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। সেগুলিতে বেল সাহেবের কথাই ছিল বেশি, আমার কথা সামান্য। বর্তমান প্রবন্ধে বেল সাহেবের কথা সামান্য, আমার কথাই বেশি। তথাপি প্রেরণা ক্লাইভ বেল থেকে নেওয়া হয়েছে স্বীকার করা দরকার। নইলে বিবেকদংশনের জ্বালা ভোগ করতে হবে।

রিনেসাঁস গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

রিনেসাঁস কথাটার শব্দগত অর্থ পুনর্জন্ম, অর্থাৎ পুরাতনে ফিরে যাওয়া, অথবা পুরাতনকে ফিরে পাওয়া; কিন্তু ভাবগত অর্থ নবজন্ম, মানে মানবমহিমা তথা বুদ্ধি ও কল্পনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রিনেসাঁসের ইতিহাস তাই জীবন-সূর্যের পুনরোদয়ের ইতিহাস—বুদ্ধি ও কল্পনার জয়যাত্রার ইতিহাস।

য়ুরোপের ইতিহাস থেকে কথাটি নেওয়া হয়েছে। অতএব একবার সেদিকে তাকানো দরকার।

য়ুরোপের মধ্যযুগ শাস্ত্রশাসনের যুগ—পোপের সর্বময় প্রভুত্বের যুগ। বুদ্ধিবিচার, অনুভূতি-কল্পনা প্রভৃতি মানবীয় গুণসমূহের প্রতি এ-যুগ আস্থাহীন। জগৎ ও জীবনের প্রতি এ-যুগের বিস্ময়-দৃষ্টি নেই, বরং এসবকে তা পতনের ফাঁদ বলেই গণ্য করে। সৌন্দর্যও প্রেম, এসব তো শয়তানের কারসাজি, সুতরাং এদের জব্দ করা আর শয়তানকে জব্দ করা এক কথা। তাই চলল আত্মবিকাশের পরিবর্তে নিদারুণ আত্মনির্যাতনের পালা। আর এই নির্যাতনে-নির্যাতনে ক্ষীয়মাণ মানবাত্মা পরিণামে বিদ্রোহী হয়ে প্রশ্ন করলে : এ কি সত্যি? এই জগৎ ও জীবন, এই প্রেম ও সৌন্দর্য এসব কি সত্যই মিথ্যা? এই সন্দিগ্ধ-দৃষ্টি তাকে নিয়ে গেল সত্যের সোনার সিংহদুয়ারে, সে বুঝতে পারলে জীবনচর্চাই জীবনের উদ্দেশ্য, আর প্রেম সৌন্দর্যকল্পনা ও বিচারবুদ্ধির অনুশীলনই জীবনের অনুশীলন। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক যুগের সুপ্রভাত। মানবমহিমা মেঘমুক্ত সূর্যের মতো প্রকাশিত হয়ে এই উজ্জ্বল প্রভাতের সৃষ্টি করলে।

জীবনপ্রীতির এই সোনার ফসল ফলল গ্রিক জ্ঞানচর্চার ফলে। গ্রিক সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পের গোড়ার কথা-যে দেহকেন্দ্রিক জীবনপ্রীতি, এ একরকম সাধারণ সত্য। কিন্তু তাই বলে গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ফিরে পাওয়াকেই রিনেসাঁস বললে ভুল করা হবে, যেমন ভুল করা হবে উপায়কে লক্ষ্য বা লক্ষণকে আসল বস্তু বলে গ্রহণ করা হলে।

অতএব পুরাতনে ফিরে যাওয়াই রিনেসাঁস নয়, জীবনপ্রীতি তথা বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনাপ্রীতিই রিনেসাঁস। ওয়ালটার পেটার বলেন : রিনেসাঁস কথাটা আজকাল কেবল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন গ্রিক-সাহিত্যপ্রীতি না বুঝিয়ে এমন এক জটিল আন্দোলন বোঝায়, গ্রিক-জ্ঞানপ্রীতি যার একটা দিক বা লক্ষণ মাত্র! তাঁর মতে রিনেসাঁসের যুগ বুদ্ধি ও কল্পনার বস্তুর প্রতি আগ্রহশীল এক উদার জীবনের যুগ। কি পুরাতন, কি নতুন, বুদ্ধি ও কল্পনার বস্তুর খোঁজে এ-যুগ চঞ্চল। অবশ্য গ্রিসের প্রতি এ-যুগের দৃষ্টি বিশেষ ও অধিক। তার হেতুও আছে;

জীবনপ্রীতির এমন উজ্জ্বল সূর্য গ্রিস ছাড়া আর কোথাও উদিত হয়নি। তাই জ্বলন্ত আদর্শের জন্য সেদিকে না তাকিয়ে তার উপায় ছিল না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রিনেসাঁসের সূত্রপাত ধরা হয়, আর ইটালিকে তার জন্মভূমি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তার পূর্বেও রিনেসাঁসের খোঁজ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকের ফরাসি দেশেও রিনেসাঁসের মতো একটা কিছু ছিল।* শাস্ত্র-শাসনমুক্ত, হৃদয় ও প্রেমের প্রাধান্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটা জীবন-দর্শন এ-যুগের আঁধার-আকাশে রাত্রিশেষের শুকতারার মতো উজ্জ্বল। প্রভেন্স কবিতায় তার দৃষ্টান্ত মেলে।

পণ্ডিতপ্রবর আবেলার্ডের প্রেমকাহিনী আর আমিস ও আমিলের প্রাবাদিক বন্ধুতার গল্প হৃদয় ও বুদ্ধির মুক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; অকাসিন ও নিকোলেতের প্রেমকাহিনীও তাই। প্রথম দুটি বীর্যে আর তৃতীয়টি মাধুর্যে মণ্ডিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর আলোকপন্থীদের যে-কঠোর বিরোধিতার ভেতর দিয়ে গিয়ে বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে হয়েছিল মধ্যযুগের আবেলার্ডকে তার চেয়ে কম বিরোধিতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়নি। আলোকপন্থীদের আলোর পিপাসায় যে দুঃখের আবির্ভাব, আবেলার্ডের জীবন সেই দুঃখে জর্জরিত, তবু অপরাজিত মন নিয়ে ঝড়ঝাপটা-বিধ্বস্ত মহীরুহের মতো তিনি দণ্ডায়মান। প্রেম ও জ্ঞানের এমন সুন্দর সমন্বয় স্বল্পই দৃষ্ট হয়। জ্ঞানী তিনি, প্রেমের জন্য নির্যাতনকে পরম বরণীয় বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

প্রচলিত নীতিবিরোধিতা মধ্যযুগীয় রিনেসাঁসের একটি বিশেষ লক্ষণ। হৃদয় ও বুদ্ধির মুক্তির তাগিদে ধর্ম ও নীতির বেড়া অতিক্রম আলোকপন্থীরা জীবনপ্রীতিরই নিদর্শন বলে গ্রহণ করলেন। মানা নয়—জানা, বোঝা ও জয় করাই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠল। ইন্দ্রিয়সুখ ও কল্পনাবিলাসের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধীরে ধীরে খ্রিস্টানধর্মের সীমানার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, আর তাঁদের প্রেম যেন একটা অদ্ভুত পৌত্তলিকতা একটা ভিন্ন ধর্মের রূপ গ্রহণ করল। আবার ফিরে এলেন ভেনাস, ফিরে এল দেহকেন্দ্রিক পূজা। এই নীতিবিরোধিতা (অ্যান্টিনোমিয়ানিজম) সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অকাসিন ও নিকোলেতের গল্পে। অকাসিনকে যখন নরক-যন্ত্রণার ভয় দেখানো হয়েছিল, তখন তিনি যা বলেছিলেন তা সত্যই বুদ্ধি ও বীর্যে ভাস্বর। প্রেমপ্রবণ, সজাগ-ইন্দ্রিয় সেই যুবক স্বর্গের পথে একদল জরাজীর্ণ নিরানন্দ পুরোহিত ছাড়া আর কিছুই দেখতে না পেয়ে পণ্ডিত, বিলাসী ও রসিকদের সঙ্গে নরকের

* শুধু মধ্যযুগীয় ফরাসি দেশেই যে রিনেসাঁসের পূর্বাভাস দৃষ্ট হয় তা নয়, ইংলন্ড ও ইটালিতেও তার পরিচয় মেলে। প্রতি দেশেই যেন কয়েকটি কোকিল বসন্তের অগ্রদূতের মতো শীতের মরসুমেই গেয়ে উঠতে চেয়েছিল, দু-একটি ফুল আগেভাগেই ফুটে উঠে অনাগত বসন্তকে অভিনন্দিত করতে চেয়েছিল। (এরা যেন সেই অগ্রদূত যাদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ওরে তোদের ত্বর সহে না আর ওরে চাঁপা ওরে উন্মত্ত বকুল।') ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলন্ডে রোজার বেকন আধুনিক বিজ্ঞানের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, আর তারও আগে ইটালিতে ফ্লোয়ার যোয়াচিম মানবাত্মার ভবিষ্যৎ বিজয়ের কথা প্রচার করতে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হন। তাঁর সেই বিখ্যাত মরমী উক্তি : The Gospel of the Father was past, the Gospel of the son was passing, the Gospel of the spirit was to be : যেন প্রকৃত রিনেসাঁসেরই আবাহনী।

পথানুসরণই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। জীবনকে প্রচলিত নীতির ঊর্ধ্বে তুলে ধরার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল।

মানব-কল্পনা ও খ্রিস্টানধর্মের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এ-যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য; আর তা দেখতে পাওয়া যায় আমিস ও আমিলের গল্পে। খ্রিস্টান-সন্ন্যাসী রচিত এই গল্পে মর্ত-মানবের স্বর্গীয় বন্ধুতার এমন সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে যে, লোকেরা এই দুই বন্ধুকে শহীদরূপে গণ্য না করে পারেনি। মানবীয় কল্পনা এখানে পবিত্র ধর্মের শ্রদ্ধা লাভ করেছে। দুই বন্ধু খ্রিস্টান-জগতে সাধুকল্প পুরুষরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। খ্রিস্টানধর্ম ও মানব-কল্পনার সুন্দর সমন্বয় সাধনই যেন এই গল্পের উদ্দেশ্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালীয় রিনেসাঁসেও সেই একই ব্যাপার। নানা আপাতবিরোধী ভাবকে একত্র করে সামঞ্জস্য-বিধানের দ্বারা একটি উদার বহুভঙ্গিম সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস এ-যুগের বিশেষ কীর্তি। পূর্বে গ্রিকদেবতাদের প্রতি তাকানো হত যে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে, গ্রিকসাহিত্য চর্চার ফলে তা ধীরে ধীরে তিরোহিত হল, এবং গ্রিকদেবতা তথা গ্রিকপুরাণ ধর্মের বিষয়বস্তুরূপে না হলেও শিল্প ও কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে সমাদৃত হল। তবে শিল্পের প্রতি পঞ্চদশ শতকের শ্রদ্ধা এতবেশি ছিল যে শিল্পের বস্তুতে ধর্মের মর্যাদা দিতে এ-যুগ কুণ্ঠাবোধ করেনি। জ্ঞান ও রসিকগণ ধীরে ধীরে গ্রিক ও খ্রিস্টানধর্মের বিরোধিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে থাকেন। পরিশেষে তা একেবারে তিরোহিত হল এবং দুই ধর্ম কালভেদে একই মানবমনের বিভিন্ন প্রকাশ রূপে গৃহীত হল।

আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ধর্মে ধর্মে এই পারস্পরিক সম্বন্ধ সহজেই স্বীকার করেন এবং ধর্ম ব্যাপারটা-যে অন্যান্য ব্যাপারের মতো ক্রমবিকাশের ফল এ-কথায় সায় না দিয়ে পারেন না। মানবমনের সৃজনশীলতাই ধর্মের গোড়ায়। অতএব এই রহস্যময় সত্তার ভিতরেই প্রাচীন ও নবীন ধর্মের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়—যেমন শৈশবের কল্পনা আর পরিণত বয়সের চিন্তা খুঁজে পাওয়া যায় একই ব্যক্তির অভিজ্ঞতায়। (সাহিত্য-কাব্যকেও প্রাচীন ও নবীন দুই ভাগে ভাগ করে দেখা হয়, কিন্তু তাই বলে তারা সত্য-সত্যই আলাদা নয়—একই মনের সৃষ্টি বলে বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের ভেতর ঐক্য সুস্পষ্ট।) তাই উদার অ-ছুৎমার্গী রিনেসাঁসের কাজ হল খ্রিস্টানধর্ম ও গ্রিকধর্মের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক খুঁজে বের করা—বিরোধমত্ত হয়ে একেকে অপর থেকে দূরে ঠেলে ফেলা নয়। মধ্যযুগ অন্ধতার দরুন যে-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গিন উঁচিয়েছিল, এ-যুগে তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না, উদারতার আবহাওয়ার দরুন সকলে যেন ঘেঁষাঘেঁষি করে চলতে শিখেছে, আর তারই ফলে কৌণিকতা মসৃণতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই সহানুভূতি, মনুষ্যত্বে এই অপরিসীম শ্রদ্ধা, এ-ই রিনেসাঁসের গোড়ার কথা। ভেদনীতি নয়, মিলন-নীতির ওপরই এর প্রতিষ্ঠা। মানবমন এককালে যা আত্মপ্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ করেছিল, যা থেকে তা আনন্দ-বেদনার প্রেরণা পেয়েছিল, তা তুচ্ছ ও বাজে নয়, তার মধ্যেও খুশি হবার জিনিস রয়েছে, এই প্রত্যয়ে এ-যুগের আত্মা উজ্জ্বল। স্বাতন্ত্র্য ধ্বজা এ-যুগের আকাশে ওড়েনি; এ-যুগ বিলিয়ে দেওয়ার যুগ—সত্যের কাছে, সৌন্দর্যের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার যুগ। যা ভালো, তা গ্রহণ করো, আপন-পরের চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না—এ-ই এ-যুগের মর্মবাণী।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য এ-যুগের ছিল না, আর সেজন্য তাকে দোষও দেওয়া যায় না, কেননা তা নিতান্ত হালের জিনিস। তবু একটা মিলনাত্মক প্রেরণায় মুসার সঙ্গে হোমার ও প্লেটোর ঐক্য-সাধনের জন্য এ-যুগের আত্মা ব্যাকুল। ঐক্যসাধনের উদ্দেশ্যে নানা ব্যাপারে গোঁজামিল দিতেও তা কুণ্ঠাবোধ করেনি। এ-যুগের আত্মার বাণী যেন, 'মিলনধর্মী মানুষ মিলিবে, ভয় নাই, ভয় নাই।' মিরাণডোলার পিকো এই মিল-প্রচেষ্টার জীবন্ত প্রতীক। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল 'To bind the ages each by natural piety.' আপাতবিরোধ সত্ত্বেও গ্রিকধর্মের সঙ্গে যে খ্রিস্টানধর্মের মিল রয়েছে, উভয়ই রহস্যাভিসারী মানবমনের সৃষ্টি; পিকোর চিন্তার গোড়ার কথা তা-ই, খ্রিস্টানোপযোগী আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কম ছিল না, তথাপি প্রাচীন দেবতাদের ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানবমনের আলোক-পিপাসা থেকে সৃষ্ট বলে তাঁরা তাঁর কাছে আলোকেরই দূত। গ্রিকদেবতাদের পেছনে যে-কল্পনার সত্য রয়েছে, তা তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন।

পিকোর রচনার উদ্দেশ্য, মানবপ্রকৃতির মহিমা ও মানুষের সৌন্দর্য প্রচার। মধ্যযুগে মানব-প্রকৃতির প্রতি যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, পিকোর রচনা যেন তারই যোগ্য প্রতিবাদ। তারই ফলে রিনেসাঁসের যুগে দেহ, বুদ্ধি ও কল্পনার সহজ-স্বীকৃতি। প্রাচীন গ্রিসে এই স্বীকৃতির জ্বলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে বলে তিনি তার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট। মিলনের দূত তিনি, তাই প্রাচীন গ্রিস ও খ্রিস্টানজগতের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার জন্য 'হেপ্টেপ্লাস' বা 'ডিসকোর্স অন দি সেভেন ডেজ অব ক্রিয়েশন' রচনা করলেন। প্লেটোর 'টিমিয়াসের' সঙ্গে মুসার 'জেনেসিসের' যে সাদৃশ্য রয়েছে, এ পুস্তকে তাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। এরূপ প্রয়াসের ফলে রিনেসাঁসের যুগে দুই ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে এক ঐশ্বর্যময় নব পুরাণের সৃষ্টি। জেরুজালেম ও পিসার মাটির সংমিশ্রণে যেমন এক নব পুষ্পের সূচনা হয়েছিল, গ্রিস ও খ্রিস্টান পুরাণের সংমিশ্রণেও তেমনি এক নব-পুরাণের সৃষ্টি হল। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকের শিল্পে বিপরীতের যে-সুন্দর সংমিশ্রণ, পিকোর জীবন তারই বাস্তব প্রতিলিপি, আর এখানেই তার জীবনের মূল্য। জ্ঞানের জন্যই তিনি জ্ঞান খোঁজেননি, বরং জ্ঞানে জ্ঞানে মিল রয়েছে, নির্বুদ্ধিতার ফলে মানুষ তা ভুলে গেছে, এই সত্য প্রমাণিত করবার জন্যই তাঁর জ্ঞানান্বেষণ। পিকো সত্যকারের হিউমানিস্ট বা মানবতাবাদী, কেননা..."The essence of humanism is that belief of which he seems never to have doubted, that nothing which has ever interested living men and women can wholly lose its vitality—no language they have spoken, nor oracle beside which they have hushed their voices, no dream which has once been entertained by actual human minds, nothing about which they have ever been passionate, or expended time and zeal."

রিনেসাঁসের মর্মকথা এই মানবতা। শুধু পিকো নয়, পঞ্চদশ শতকের অপরাপর জ্ঞানীগুণীর ভেতরেও তা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিন্‌সি প্রমুখের রচনায় হিউম্যানিজমের প্রেরণা সুস্পষ্ট। উইন্‌কেলম্যান্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সন্তান, তিনিও

পুরোদস্তুর হিউম্যানিস্ট। গ্যেটে তাঁর এই গুরু সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি পুরোপুরি প্যাগান ছিলেন, আর খ্রিস্টানজগৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। ঈশ্বরের আদেশ নয়—মানবমন, মানুষের কল্পনা ও অনুভূতি, মানবদেহ গ্রিক সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলে তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আজীবন তার চর্চায় রত থাকেন। তাই পরবর্তীকালের লোক হলেও এই শিল্প-জহুরীকে রিনেসাঁসের শেষ ফল বলে গণ্য করা যায়।

আমাদের দেশের প্রতি এখন তাকানো যাক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রিনেসাঁসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এ-যুগ মুসলমানের সমৃদ্ধির যুগ (এখানে মুসলমানের সম্বন্ধেই শুধু বলা হচ্ছে), তাই তাদের সীমাহীন কৌতূহল। জোয়ারের নদীর মতো এখন তারা কেবলই মানুষকে আপন করতে চাচ্ছে। (ভাঁটার নদীর ভিন্ন ধারা, সে কেবলই ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বলে সঙ্কুচিত হয়ে সরে যায়।) হিন্দুর রামায়ণ-মহাভারত মুসলিম নওয়াব ওমরাহদের মনে যে সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিল তার কাছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেকখানি ঋণী। স্রষ্টার গৌরবের অধিকারী না হলেও, পালকের মর্যাদা তাদের দেওয়া যায়। রিনেসাঁসের জন্য যে উদারতা বর্তমান, এ তারই নিদর্শন। 'গোরক্ষ বিজয়' রচয়িতা ফয়জুল্লার অন্তরে যে-ভিন্নধর্মী গোরক্ষণাথের মাহাত্ম্য সাড়া জাগিয়েছিল, মানব-মহিমার অন্তর্গত বলে তা রিনেসাঁসের পর্যায়ভুক্ত। অহঙ্কার-পীড়িত মানবমন (সে অহঙ্কার ব্যক্তিগতই হোক, আর জাতিগতই হোক) অপরের মাহাত্ম্য ও কীর্তি উপলব্ধি করতে অক্ষম। ফয়জুল্লা যে পেরেছিলেন এতেই বুঝতে পারা যায়, প্রেমের প্রসাদে অহমিকামুক্তি তিনি লাভ করেছিলেন। শুধু ফয়জুল্লা নয়, অন্যান্য কবি ও গীতিকারের রচনায়ও এর নিদর্শন প্রচুর। হিন্দু দেব-দেবী, রাধাকৃষ্ণ, কামরতি প্রভৃতির নাম তো সকলের কাব্যেই বর্তমান। কবি বলে কল্পনার বস্তুর মর্যাদা দিতে তাঁরা শিখেছিলেন। ছুৎমার্গী তাঁরা ছিলেন না—বৈশিষ্ট্যের তুষার প্রাচীর তাঁদের প্রেমের উত্তাপে গলে যাচ্ছিল।

রিনেসাঁসের দু'টি দিক বুদ্ধি ও হৃদয়। এ-যুগে বুদ্ধির সাধনা বিশেষ হয় নি, কিন্তু প্রেমের সাধনা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের রূপকে বহু কবি আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। আউল-বাউলের রচনায় বিবাগী মনের যে-বেদনা তা সত্যই মহান, আর আজো তা বহু ভাবুকের অশ্রু-নির্ঝর। ধর্মের সম্পর্ক বর্জিত নিছক মানবীয় প্রেম-কাহিনী রচনার পথপ্রদর্শকও মুসলমান। দৌলত কাজি, আলাওলের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনা থেকেই 'টেল ফর টেলস্ সেকে'র শুরু। মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে যে মানবমহিমা গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছিল নিচের দুটি পদে তার পরিচয় পাওয়া যায় :

> মোর পরে পয়গম্বর না জন্মিবে আর॥
> মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ।
> প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন।
> শাস্ত্রসব ত্যাগ করি ভাবে ডুম্ব দি-আ।
> প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়ি-আ॥

*   *   *

আমার   হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে যুগ যুগ ধরি,
তাতে   তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা, উপায় কী করি?
            ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটার না হয় শেষ;
            এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তার বিশেষ।
            ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর, পারো না যে তাই।
তাই   তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই॥

মিলন-স্পৃহার তাগিদে ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টাও এ-যুগে কম হয় নি। প্রেমের জাদুতে পরকে আপন করবার জন্য এ-যুগ ব্যাকুল।

পুবেতে বন্দনা করি পুবে ভানুশ্বর
একদিকে উদয় ভানু, চৌদিকে পশর॥
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী-সাগর
যেখানে বাণিজ্য করে চাঁদ সদাগর॥
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাস পর্বত
যেখানে পড়ি আছে আলীর মালামের পাথর॥
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান।
উদ্দেশে বাড়ায় সালাম মোমিন মুসলমান॥
সভা করি বস্‌ছ ভাইরে হিন্দু-মুসলমান;
সভার চরণে আমি জানাই সালাম॥

একই সভায় হিন্দু মুসলমান আসীন। অতএব কেবল মুসলমানের কথা বললে চলে না, হিন্দুর কথাও বলতে হয়; নইলে হিন্দু-মুসলমান উভয়কে সালাম জানানো অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কবি তাই আগে থাকতে বিশ্বাস সৃষ্টি করে পরে সালাম জানিয়েছেন।

কিন্তু এই প্রেম, চিন্তার এই স্বাধীনতা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি, পরাজয়ের বিষাদের ছায়ায় মুসলমান যে শোচনীয় অস্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করলে, তাতে মানব মহিমা ব্যাহত হল। কল্পনা ও প্রেমকে বর্জন করে শুধু শাস্ত্রকেই জীবনের একমাত্র নিয়ামক বলে গ্রহণ করা হল বলে আনন্দ বিদায় নিলে, রুক্ষতা প্রবলপ্রতাপান্বিত হয়ে জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করলে। (আজো তার প্রতাপ কমেনি, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই অবশ্য থেকে গেছে, কিন্তু বুদ্ধি ও কল্পনার বিরুদ্ধে লড়াই সমান চলেছে।) স্বাতন্ত্র্যের অবতাররা বৈশিষ্ট্যের তুঙ্গ প্রাচীর তুলে আলাদা হয়ে বাস করাই জীবনের চরিতার্থতা মনে করলেন, আর তারই ফলে মানসিক ছুৎমার্গ মুসলমান সমাজে শিকড় গেড়ে বসল।

ওহাবী মনোভাবের কথা বলছি। এ কেবল গোসা করতে, কেবলি আলাদা হতে শিখেছে, প্রেমের অপরিমেয়তায় জীবনের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে শেখেনি। অবশ্য এ মুসলমানকে যোদ্ধৃবেশ দিয়েছে; বীরত্ব-প্রেমিকরা এইজন্য তার প্রতি বিস্মিত-দৃষ্টি। কিন্তু এই যোদ্ধৃবেশের পেছনের কোনো বড় লক্ষ্য নেই বলে মোটের ওপর তা অসার্থক। স্বাধীন

দেশে মুসলমানের ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর মুখে হাসি ফুটুক (প্রতিবেশীর মুখে হাসি না ফুটলে মুসলমানের মুখে হাসি ফুটতে পারে না, কেননা ভাগ্যের একই তরীতে তারা ভাসমান), মুসলমানের জীবন সার্থক হোক, ফুলে ফুলে সুশোভিত হোক—এই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে তার যুদ্ধোদ্যম নয়, ইসলামকে অবিকৃত অপরিবর্তিত রাখতে হলে স্বাধীনতার প্রয়োজন, এই চিন্তাই তার প্রেরণাকেন্দ্র। সুতরাং তা থেকে কোনো বড়কিছু আশা করা অন্যায়। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই ধর্ম—চিন্তা-জগতের এই প্রাথমিক সাধারণ সত্যই মর্মগত হয়নি বলে তা ব্যর্থতারই আরাধনা করেছে।

তারপরে ইংরেজিশিক্ষার যুগ। কিন্তু সানন্দচিত্তে গৃহীত হয়নি বলে সংস্কৃতিজগতে তাও বন্ধ্যা প্রমাণিত হল। নব-শিক্ষা মানে নব-বিশ্বাস। মুসলমান নব-শিক্ষাকে গ্রহণ করলে সন্দিগ্ধচিত্তে—কেবলই টিকে থাকবার জন্যে। সুতরাং কতিপয় চাকুরে সৃষ্টি ছাড়া তা আর কিছুই করতে পারলে না। বুদ্ধি-অনুভূতি-কল্পনা, সাহিত্য-শিল্প-আনন্দ তখনো মুসলমানের মর্মগত হয়নি। সে কেবলই বৃদ্ধের মতো লাঠিতে ভর দিয়ে জীবনের ভার বয়ে চলেছে। সংস্কৃতির এই শীতের দেশে হঠাৎ এলেন নজরুল ইসলাম। বসন্তের মত্ততার মতো তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রিনেসাঁসের আবির্ভাব হল—বুদ্ধি অনুভূতি ও কল্পনার দ্বার খুলে গিয়ে মানব-মহিমা উপলব্ধ হল। তাঁর 'বিদ্রোহী' মানব-মহিমারই কাব্য। বন্ধন-জর্জর মানবাত্মার যন্ত্রণা এখানে বিদ্রোহের বেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। জরাজীর্ণ দৈন্য দুর্দশাময় পুরোনো পৃথিবী ভেঙে নতুন পৃথিবী গড়ার প্রয়াস-যে মানব-মহিমার চূড়ান্ত, তা সহজেই স্বীকার্য। বাঁচবার স্বাদ আমরা প্রথমে নজরুলের কাব্য থেকেই লাভ করি, জীবনের নিয়ামক যে জীবন নিজেই, আর কিছু নয়, শাস্ত্র-সংহিতা সেখানে শুধু মন্ত্রণা দিতে আসতে পারে, এ-বোধ সর্বপ্রথমে নজরুলের কাব্য থেকেই আমরা পাই। উপদেশ নিয়ে নয়, উচ্ছল সজীব জীবনের প্রতীক হয়ে তিনি তা প্রমাণিত করলেন। জীবনের আগ্রহে জীবনের প্রতিকূল আইনকে আমল দিতে তিনি চাননি—তাকে বন্ধনের রজ্জু বলেই মনে করতেন। যে প্রচলিত নীতিবিরোধিতা (অ্যান্টিনোমিয়ানিজম) রিনেসাঁসের একটি বড় নিদর্শন, নজরুলের জীবনে ও কাব্যে তা সুপ্রচুর। আবেলার্ড, পিকো প্রভৃতি যে-বিরোধিতার ভেতর দিয়ে গিয়ে আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন নজরুল ইসলামেও তা বর্তমান। ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নজরুলের কাব্যে সুস্পষ্ট। হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কবিতা তো রচনা করেছেনই, ভাবসৌকর্যের জন্য একই রচনায় হিন্দু-প্রতীক ও মুসলমান মহাপুরুষের নাম গ্রহণ করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। এটা চিত্তের বীর্যশালিতারই পরিচায়ক।

হিন্দু ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখবার এই-যে প্রয়াস, এর জন্য রিনেসাঁসকামী কোনো কোনো লেখক দুঃখ ও লজ্জাবোধ করেন। তাঁদের কথা : রবীন্দ্রনাথ মুসলমানী ব্যাপার নিয়ে কোনো কবিতা লিখলেন না, অথচ নজরুল ইসলাম কিনা বেহায়ার মতো (কথাটা অবশ্য তাঁরা ব্যবহার করেন না, কিন্তু মনের কোণে ওরকম একটা কথা থেকে যায়।) বহু হিন্দুয়ানি রচনা লিখলেন। এতে তাঁদের জাতীয়-সম্মানবোধ ক্ষুণ্ন হয়, তাঁদের মাথা

নুয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, তাঁরা যে মনোভাবের দ্বারা পীড়িত, সে হচ্ছে প্রেসটিজ-বোধ, আর এ প্রেসটিজ-বোধ থেকে-যে জগতে কত অনাচার হয়েছে ও হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রসঙ্গত আজকাল লোকেরা প্রেসটিজের যতটা পূজা করে, ডিগনিটির ততটা পূজা করে না। তারই ফলে জগৎ অত্যাচার-অবিচার ও কলঙ্ক-কুশ্রীতায় পরিপূর্ণ। সত্য কি মিথ্যা, এ প্রশ্ন আজ বড় নয়, সম্মান রক্ষা হবে কি হবে না এ-প্রশ্নই বড়। এরই ফলে কয়েকটি বিভ্রান্তিকর শব্দের সৃষ্টি : ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স, সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইত্যাদি। বুলির মতো এরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু মনের ব্যাপার বলে এদের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া কঠিন। মুশকিল এই যে, যাকে সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স বলা হয় তার নিচে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স লুকিয়ে থাকে, আর প্রেম আর সত্যানুসরণকে যে অনেক সময় ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স বলে গাল দেওয়া হয়, এ তো প্রায় সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়। অতএব ইনফিরিওরিটি সুপিরিওরিটি প্রভৃতি কমপ্লেক্সের আবর্তে পড়ে সত্য-মিথ্যার প্রশ্নকেই বড় করে তোলা দরকার। কেননা, তা-ই আমাদের জীবনকে সারল্য তথা শক্তিমণ্ডিত করতে সক্ষম।

নজরুল ইসলাম যে হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখলেন, আর রবীন্দ্রনাথ যে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লিখলেন না, তার কারণ সোজা। হিন্দুর ঐতিহ্যে নজরুল তথা মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের তথা হিন্দুর উত্তরাধিকার নেই। প্রাণের যোগ নেই বলে বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি একপ্রকার জলবায়ুর মতো সহজ। তা বোঝা কঠিন নয়, তাকে জানতে হয় না, সে নিজেই নিজেকে জানিয়ে যায়, আর আমরা জেনেও টের পাইনে যে জেনেছি। এই দিনের আলোর মতোই সহজ সত্যকে যাঁরা অস্বীকার করেন, মাটির বাঁধনকে স্বীকার করতে চান না, শুকিয়ে মরা তাঁদের ভাগ্যলিপি। (ইউরোপীয় রিনেসাঁসকে এক হিসেবে মাতৃভূমির সাধনার সঙ্গে পিতৃভূমির সাধনার সংমিশ্রণ-প্রয়াস বলা যেতে পারে।) হিন্দু ঐতিহ্য, মুসলিম ঐতিহ্য এ-দুয়ের সংমিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয়—কেননা, হিন্দুর দুই উত্তরাধিকার নয়। অথচ সে-মিলনের জন্য বারবার হিন্দুর দিকেই তাকানো হয়েছে; বলা হয়েছে হিন্দু বড়ভাই ও মুসলমান ছোটভাই, সম্প্রীতির কথাটি বড়ভাইয়ের তরফ থেকেই আসা উচিত। কিন্তু প্রশ্নটি আসলে সম্প্রীতির নয়, উত্তরাধিকারের; আর উত্তরাধিকারের ব্যাপকতায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে বড়—মাতৃ-সম্পত্তি ও পিতৃ-সম্পত্তি উভয়েরই সে ওয়ারিশ। মুসলমান যদি এই দুই উত্তরাধিকার স্বীকার করে, তবে তার দ্বারা এক বড় সৃষ্টি সম্ভব—আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মন্থনদণ্ডে মন্থিত করে সে দুই সংস্কৃতিকে এক বিরাট নব-সংস্কৃতিতে পরিণত করতে পারে। এ গৌরব মুসলমানের জন্যই অপেক্ষা করছে, তবে সে তা চায় কি না, সেটাই প্রশ্ন। প্রতিভার স্বাদ পেতে হলে এই মিলন-সাধনা তথা জীবন-সাধনার সাধক হওয়া দরকার। বিরোধ অত্যন্ত সোজা, মিলন কঠিন, কঠিনের সাধনাই প্রতিভা-বিকাশের একমাত্র পথ, তা ভেতরের সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তোলে, নিদ্রার অবকাশ দেয় না।

(বিরোধ বলতে আমি অপর সম্প্রদায় বা অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ বুঝেছি, নিজের সম্প্রদায় বা নিজের সঙ্গে নয়। নিজের জাতির সঙ্গে বিরোধ অত্যন্ত কঠিন, মহাপুরুষের জীবনেই তা দৃষ্ট হয়।)

হিন্দুর উত্তরাধিকার যে অনেকখানি মুসলমানের উত্তরাধিকার তার প্রমাণ, হিন্দুর অনেক কিছুই আমরা জানি, বুঝি ও উপভোগ করি এবং এইজন্য দুঃখও প্রকাশ করি। এই জানার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. সব মুসলমান আরব কি ইরান তুরান হতে আসে নি। অন্তত শতকরা পঞ্চাশজন হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে।
২. বিদেশাগত বাকি পঞ্চাশজনের প্রত্যেকে যে স্বদেশ থেকে পত্নী নিয়ে এসেছিলেন এমন মনে করা বাতুলতা। অন্তত বিশজন দেশী পত্নী গ্রহণ করেছিলেন।
৩. হিন্দুধর্ম উৎসবময়, আর উৎসব-ছোঁয়াচে। হিন্দুর নানা উৎসবের সংস্পর্শে এসে, বিশেষ করে যাত্রা-পাঁচালি, কবিগান ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে মুসলমান বেমালুম হিন্দুধর্মের অনেক কিছু জেনেছে ও পেয়েছে।
৪. কালচারের ব্যাপার হয়ে হিন্দুধর্ম সাধারণতা লাভ করেছে, আর তারই ফলে তা মুসলমানের মনে প্রবেশপথ খুঁজে পেয়েছে। সাহিত্য তথা আনন্দের বস্তু হয়ে (কাব্য কাহিনীময় বলে) তা আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করেছে, আর আমরা বেদরদীর মতো দ্বার রুদ্ধ করে থাকতে পারিনি। (মুসলমান ধর্মও সাহিত্য তথা আনন্দের ব্যাপার হয়ে হিন্দুর অবচেতনে স্থান নিতে পারত, কিন্তু সে প্রচেষ্টা আজো বিশেষ হয়নি। আরবি ও ফরাসি ভাষার সিন্দুক হতে মাতৃভাষার সূর্যালোকে ইসলামকে মুক্তি না দিলে তা সম্ভব হবে না। সেজন্য ইসলাম-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-প্রীতিও প্রয়োজনীয়। কেননা, রোগী-প্রীতি ব্যতীত চিকিৎসকের সার্থকতা অসম্ভব। কিন্তু যেরূপ আরবি-পারসি মিশ্রিত রচনার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, তাতে সে ভরসাও হয় না। মনে হয়, রচনাগুলি কেবলি আরবি-পারসি জানা মুসলমান পাঠকের জন্য লেখা হচ্ছে, সাধারণ বাঙালি পাঠকের জন্য নয়)।

এইসব কারণে হিন্দুর উত্তরাধিকার অনেকটা মুসলমানেরও উত্তরাধিকার। অসূয়াপরবশ হয়ে মুসলমান জোর করে তা অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তা হলেই তা মিথ্যা হয়ে যাবে না। আজো বাঙালি মুসলমান খাঁটি মুসলমান হয়নি। এ দুঃখের ভেতরেই আমার কথার সত্যতা জাজ্বল্যমান।

নজরুল ইসলামের হিন্দুয়ানি রচনা লিখবার কারণ এইখানে। এ তার উত্তরাধিকার প্রমাণিত করে, ব্যভিচার নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ না করে আরবদেশে জন্মগ্রহণ করতেন ও আরবি ভাষায় কাব্য রচনা করতেন তো আরবদেশের 'রেস-কালচারের' প্রভাব এড়িয়ে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত। মুসলমান না হলেও মুসলমানির প্রভাবযুক্ত তিনি হতেনই, এ এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে, এ নিয়ে তর্ক চলে না, যেমন তর্ক চলে না নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্তিত্ব নিয়ে।

নজরুল ইসলাম রিনেসাঁসের প্রেরণা : বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর রচনার মারফতে তা আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু শুধু ইসলামি রচনার জন্য তাঁকে 'রেনেসাঁ গুরু' মনে করা ছেলেমি ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁরা এরূপ বলেন, তাঁরা রিনেসাঁস কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। রিভাই-ভালইজ্মকে তাঁরা রিনেসাঁস বলতে চান। (রিভাইভালইজম ও রিনেসাঁসের পার্থক্য কী, এ প্রশ্ন অনেকে করেন। উত্তরে বলতে পারা যায় : রিনেসাস মূল্যবোধ, রিভাইভালইজম অহমিকা-বোধ, রিনেসাঁসের জন্য বিশেষ জাতি তার নিজের সৌন্দর্যের দিকেও তাকাতে পারে, সেটা অন্যায় নয়। কিন্তু শুধু সেদিকেই তাকানোর প্রবৃত্তি অন্যায়। কেননা, সেটা সৌন্দর্যপ্রেরিত নয়, অহঙ্কারপ্রেরিত। আর অহঙ্কার যে বহুল, সে জানা কথা।)

প্রাণের অন্ধ আবেগে নজরুল যা করতে চেয়েছিলেন 'মুসলমান সাহিত্য-সমাজ (ঢাকা)' তারই জাগ্রত প্রচেষ্টা। বুদ্ধির মুক্তি ছিল এর লক্ষ্য। সচেতনভাবে দলবদ্ধ হয়ে সমাজের কর্মকর্তারা বুদ্ধির মুক্তির যে-আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন, তা সত্যই অপূর্ব—শুধু মুসলমান সমাজের নয়, বাংলার সংস্কৃতি-আন্দোলনে এর এক বড় স্থান। মানুষের জীবন ছিল এর সামনে; জীবনের বহুভঙ্গিম বিকাশকে সম্ভব করে তোলাই ছিল এর স্বপ্ন। রিনেসাঁসে বড় হয়ে উঠেছিল যে জীবন—পরকালমুখী ধর্মসাধনা নয়, ইহকালমুখী জীবন সাধনা, মানে জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রয়াস, সাহিত্য সমাজেরও লক্ষ্য ছিল তাই। জীবন সুন্দর হোক, ঐশ্বর্যময় হোক, তার বিকাশের অন্তরায় দূরীভূত হোক, এ-ই ছিল তার অন্তর্নিহিত কামনা। জ্ঞান, প্রেম ও বুদ্ধির সন্নিপাতে জীবনের যে ঐশ্বর্যময় জয়যাত্রা, তার স্বপ্নে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের চিত্ত আন্দোলিত হয়েছিল। সেজন্য কোনো ইজমের তাবিজে বিশ্বাসী না হয়ে গভীর জীবনানুভূতির আশ্রয় গ্রহণই এঁরা কল্যাণপ্রদ মনে করেছিলেন।

ধর্ম উপেক্ষা করা নয়, বুঝা ও উপলব্ধি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। ধর্ম-যে মানবকল্যাণের এক অনুপম নিদান, প্রেমে-পুণ্যে জীবনকে ধন্য করার উপায়, অন্ধ অনুসরণের ব্যাপার নয়—এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন সমাজের কর্মকর্তারা। অথচ সেজন্য তাঁদের নিন্দিত ও নিপীড়িত হতে হয়েছিল; সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতার সাক্ষী হয়ে তা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে আছে। এই বিরোধিতার ভেতর দিয়ে গিয়ে তাঁরা মানব-মহিমারই জয় ঘোষণা করলেন।

এটি রিনেসাঁসেরই লক্ষণ। রিনেসাঁসের অপর লক্ষণ-যে মিলনপ্রয়াস, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে মিলন সাধনের শুভচেষ্টা, সেও এই আন্দোলনের বিষয়বস্তু। ছুৎমার্গী বৈশিষ্ট্যের বাণী প্রচার না করে তা মিলনের বাণীই প্রচার করেছিল। বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনার দ্বার খুলে দিয়ে দেশকে প্রেমের ও কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এর লক্ষ্য।

(সাহিত্য-সমাজ সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। এই প্রবন্ধে সকল কথার ঠাঁই হতে পারে না। তাই সংক্ষেপে সেরে নিলাম)।

এর আরব্ধ কাজ শেষ হতে পারেনি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আবির্ভাবে। তা না হলে এ বাঙালির জীবনে সোনা ফলাতে পারত। মুসলিম-সমাজে যদি কখনো সত্যিকারের

রিনেসাঁসের আবির্ভাব হয়, তবে উপলব্ধ হবে যে তার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। পঞ্চদশ শতাব্দীর রিনেসাঁস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে : The Renaissance of the fifteenth century was in many things, great rather by what it designed than by what is achieved, 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' সম্বন্ধেও তা বলা যেতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যা আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতকে তা পূর্ণ হয়েছিল। বাঙলার মুসলমান-সমাজে সেই 'অষ্টাদশ শতাব্দী' এখনো দূরে, কেননা পথে বহু অন্তরায়। দ্বন্দ্বের যুগ রিনেসাঁসের যুগ নয়, কারণ তাতে বুদ্ধির অপ্রমত্ততা রক্ষা করা কঠিন। বিদ্বেষাশ্রিত মন নিয়ে মানুষ কখনো সত্যাভিসারী হতে পারে না। সত্যানুসরণ নয়, কেবলি শত্রুপক্ষের চালচলনের দ্বারা তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। এইজন্য উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগ রিনেসাঁসের যুগ হতে পারে না। অসহিষ্ণুতার মন্ত্রে দীক্ষিত বলে অনেক সময় তা মনের উপর জবরদস্তি করে থাকে। আর রিনেসাঁস আর যাই হোক, জবরদস্তি বা অসহিষ্ণুতা নয়।* অনেক সময় শত্রুর দুর্বলতা তার কাছে মনোহর মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়, আর অসহায়ের মতো সে তার অনুসরণ না করে পারে না। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে তার প্রমাণ প্রচুর।

বাংলা সাহিত্য যদি হিন্দুয়ানি ও সংস্কৃত শব্দে বোঝাই হয়ে থাকে, তবে সেখানে তার দুর্বলতা, শক্তি নয়। হিন্দুর অহঙ্কার তাতে স্ফীত হতে পারে, কিন্তু রসিকের রসতৃষ্ণা তৃপ্ত হতে পারে না। কিন্তু দ্বন্দ্বের যুগের চিন্তাশীল মানুষকে সেই দুর্বলতার অনুসরণে উৎসাহিত করেন—যা বর্জনীয় তা-ই গ্রহণীয় বলে প্রচার করেন। তিনি বলেন : হিন্দু যে ওরূপ করেছে, তাতে তার অন্যায় হয়নি, মুসলমান যে করেনি সেইটেই তার অন্যায়। কী চমৎকার যুক্তি! বাংলা সাহিত্য মোটের ওপর উন্নত ও প্রগতিশীল হলেও তার বেশিরভাগই যে বোঝা ও বাজে, তা অনস্বীকার্য। অথচ এই বোঝা ও বাজের অনুসরণ করতে তাঁর উপদেশ।

হিন্দুয়ানি ও মুসলমানিতে সাহিত্য ভারাক্রান্ত করা অন্যায়। কেননা, সাহিত্য গভীর জীবনবোধের ব্যাপার, কোনো 'আনি'র ব্যাপার নয়। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তা সেখানে মাঝে মাঝে আসতে পারে, কিন্তু সর্বময় প্রভু হয়ে তাকে গ্রাস করতে পারে না। আর মনে রাখা দরকার 'আনি'র প্রভাব থেকে জীবনকে রক্ষা করা যখন সাহিত্যের, বিশেষ করে আধুনিক চিন্তাসাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য তখন তা নিয়ে কোন্দল অনাধুনিকতারই প্রমাণ। 'আনি'র প্রভাবে নিয়ে যাওয়া আর জীবনকে কারাগারে বন্দি করা

* রিনেসাঁস বহুভঙ্গিম জীবন—একটি আদর্শের পিঁজরায় পুরে তোতাপাখিপনা শেখানো নয়। বিচিত্র জীবনের ডাকে মানুষ বিচিত্র পথের পথিক হয়; তাই সহজ সরল পন্থা জাতিগত বা সম্প্রদায়গত না হয়ে ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে। মুক্তি আসে নানান মূর্তি ধরে—একজনের পক্ষে যা মুক্তির সরল পথ অপরের কাছে তা সরল নাও মনে হতে পারে। প্রবণতার বিভিন্নতাই এর হেতু। একই ব্যাপারে সকলের মনে সাড়া জাগবে, এমন আশা করা ভুল। ইরানের নার্গিসনয়না সাকির বিরহে কেউ দেওয়ানা হতে পারে, আবার কারো পক্ষে কালিদাসের নিপুণিকা চতুরিকার শোকে ম্রিয়মাণ হওয়া স্বাভাবিক। এই-যে বিভিন্ন রুচি, একে শুধু রক্ষা করা নয়, পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা এবং এদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করে ঐক্য স্থাপন করা—এ-ই রিনেসাঁসের মূল প্রবৃত্তি, এর ব্যতিক্রম আর যা-ই হোক, রিনেসাঁস নয়।

যে এক কথা, চিন্তাশীলের তা বুঝা উচিত। তবে না বুঝলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না (বুঝলে অবশ্য প্রশংসা করা যায়), কেননা তিনিও অন্যান্য মানুষের মতো যুগের সন্তান এবং অস্থির যুগে মতির প্রশান্তি রাখতে পারে কম লোকেই।

এই অস্থির দ্বন্দ্বময় যুগে রিনেসাঁসের সাধনা সহজ ব্যাপার নয়। রিনেসাঁসের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। কেননা, তা জীবনসূর্যের উপাসনা আর চিন্তামুক্ত না হলে তা সার্থকভাবে করা যায় না। মেঘলা দিনে সূর্য-উপাসনা চলে না, আর এ-যুগ সত্যই মেঘলা যুগ, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবসর নেই। শুধু রাজনৈতিক বিরোধ নয়, এ-যুগের অর্থনীতি বা অর্থনীতিহীন যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে, তা দূরীভূত না হলে রিনেসাঁস তথা বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনার সাধনা অসম্ভব।

অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়নি বলে মানবসভ্যতা বারবার ভেঙে পড়েছে এবং এবারও ভেঙে পড়তে চাচ্ছে। সুতরাং তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। Man does not live by bread alone, he needs spritual food, এ-ধরনের বড় বড় কথা বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু 'ব্রেডে'র চিন্তা থেকে মানুষকে রেহাই দেবার চেষ্টা হয়নি একবার। সুতরাং স্পিরিচুয়ালিটি শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে কথার কথা। ব্রেডের ব্যাপারটি সুব্যবস্থিত করে এই ফাঁকি থেকে যারা মানুষকে মুক্তি দিতে চাচ্ছেন তাঁরা রিনেসাঁসের তথা বুদ্ধি, কল্পনা ও অনুভূতির জয়যাত্রার পথই প্রশস্ত করছেন। তাঁদের হাতে হাত মেলাতে না পারলেও কণ্ঠে কণ্ঠ মেলানো দরকার।

রুটির কথায় বর্বরতার গন্ধ পেয়ে যে-সকল উন্নাসিক নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁদের জানাতে চাই, রুটিকে প্রধান বলে স্বীকার করা হয়নি বলেই তা বারবার সভ্যতাকে আক্রমণ করেছে। সেজন্য বর্বরতার গুটিকায় তার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হয়েছে। তার প্রতিকার টিকা। বর্বরতাকে প্রথমেই মৃদুভাবে মেনে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে সে টিকা।

সমাজতন্ত্র তারই আয়োজনে ব্যস্ত, তাই বর্বরতার বাড়াবাড়ি থেকে মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা তারই হাতে।

পৃথিবীর যে-দুঃখের কথা বলেছি তার কারণ অর্থনীতি, এ-বিষয়ে চিন্তাশীলরা একমত। কিন্তু অর্থনীতি বিজ্ঞানের এলাকার, সাহিত্যের নয়। তাই তা নিয়ে আলোচনা না করে বর্তমান অর্থনীতির পেছনে যে মনস্তত্ত্ব রয়েছে, অথবা তা থেকে যে মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কেননা, মনস্তত্ত্ব সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়ের এলাকাভুক্ত।

একটুখানি তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, আমাদের ভেতরের মানুষটি কুঅভ্যাসবশত নিজেকে খুশি করার নামে অপরকে অসুখী করতে চায়। (আমরা অট্টালিকা নির্মাণ করি নিজেরা সুখে থাকার জন্য নয়, অপরকে ঈর্ষান্বিত তথা দুঃখিত করার জন্য)। সমকক্ষের কালো মুখেই আমাদের আনন্দ। এই বিকৃত দৃষ্টির ভদ্র নামই 'কম্পিটিশন' বা প্রতিযোগিতা। প্রয়োজন না থাকলেও ছেনে-ছুনে কেড়ে-কুড়ে সিন্দুক ভর্তি করার এই কদর্য স্পৃহা—একে বর্বরতা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। নির্বোধ অথবা নিষ্ঠুর বলে (এ দুটো

অপবাদের একটি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে) আমরা বুঝতেই পারি না যে, সিন্দুকে কেবল অর্থকেই বন্দি করে রাখা হয় না, মানুষের স্বাস্থ্য ও পরমায়ুকেও বন্দি করে রাখা হয়। তাই পৃথিবী মরণে-মরণে ও অস্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে ছেয়ে যায়।

এই দুর্ভোগ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা প্রতিযোগিতা তথা অপরকে পরাজিত ও দুঃখিত করা, নব দৃষ্টিভঙ্গির গোড়ার কথা নিজেকে খুশি করা। আর পরস্পরের স্বাস্থ্য ও সখ্য পানই নিজেকে খুশি করার উপায়। এ-যুগ তাই সখ্যরস আস্বাদনের জন্য এত ব্যাকুল।

দুস্থ পৃথিবীকে সুস্থ করাই এখন বড় কথা। বুদ্ধি-মুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে রিনেসাঁস এ-ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করতে পারে। মুমূর্ষু পৃথিবী শুশ্রূষা চাচ্ছে, দানবের অত্যাচারমুক্ত হতে চাচ্ছে। এ-যুগের দুঃখ-ব্যথা, কলঙ্ক কুশ্রীতা চপেটাঘাত করে কবি-শিল্পীদের আত্ম-রতিবিরত করছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো সৌন্দর্যধ্যানী-কণ্ঠে দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আকুল আহ্বান। শিল্পী ও কবি মন নিয়ে আজ পৃথিবীকে ঢেলে সাজানো দরকার। পৃথিবী আমাদের সমগ্র প্রতিভা চাচ্ছে—আমাদের কবিতার খাতা হতে চাচ্ছে—বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনা সমস্ত তার জন্য উজাড় করে দিতে হবে।

বুদ্ধিকে নিজের কাজে না লাগিয়ে নিজেকে বুদ্ধির কাজে লাগাবার যুগ এখনো আসেনি। তারই পথ নির্মাণে আমাদের প্রতিভা নিযুক্ত করা দরকার। তবেই প্রকৃত রিনেসাঁস তথা হিউম্যানিজ্‌ম সম্ভব হবে, সুন্দরের দানে জীবনের আনন্দভাণ্ডার পূর্ণ হবে।*

---

* হিউম্যানিজ্‌মে তেমন বিশ্বাসী নন কিন্তু রিনেসাঁস-প্রয়াসী একদল লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁদের প্রচেষ্টা যেন ডেনমার্কের রাজকুমারদের বাদ দিয়ে 'হ্যামলেট' অভিনয়ের মতোই হাস্যকর। তাঁদের মতে রিনেসাঁস হচ্ছে বাঁচার জন্য একটি নবজাত শিশুর চিৎকার। কিন্তু তা সত্য নয়, রিনেসাঁস বাঁচার জন্য শিশুর চিৎকার নয় ; সৌন্দর্য প্রেম, আনন্দ ও বন্ধনমুক্তির জন্য তরুণের দাবি।

ব্যর্থতা জিন্দাবাদ

বৃদ্ধ ও তরুণ উভয়েরই নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার এমনকি ভুল করার অধিকার থাকা চাই, নইলে সমাজে প্রাণদৈন্যের অবধি থাকে না। প্রাণপ্রদায়ী ব্যাপারে—যেমন বিয়ে, বৃত্তি নিরূপণ, বন্ধুনির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে যদি তরুণরা বৃদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তো ভুল করবে। যে জাতির তরুণরা এসব বিষয়ে স্বাধীনতার পরিচয় দেয় না, সে জাতি মৃত, তার কাছ থেকে দুনিয়া কিছু আশা করতে পারে না। সে পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ।

মনে করুন নটের পেশা আপনার মনঃপূত, সেদিকেই আপনার প্রতিভা সহজ পথ খুঁজে পাবে বলে আপনার বিশ্বাস। কিন্তু আপনার গুরুজনরা তা পছন্দ করেন না। তাঁদের কাছে হয় তা নীতির দিক দিয়ে নিন্দনীয়, নয় সামাজিকতার দিক দিয়ে নিম্নস্তরের। তাই তা থেকে বিরত করবার জন্যে যত প্রকারের চাপ সম্ভব তাঁরা আপনাকে দেবেন। হয়, 'আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে আমরা তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করব' বলে তাঁরা আপনাকে শাসাবেন, নয়, কিছুদিনের মধ্যেই 'তুমি তোমার একগুঁয়েমির জন্য অনুতপ্ত হবে' বলে ভয় দেখাবেন। কিন্তু আপনার দমলে চলবে না। হয়তো এ-কথা ঠিক যে আপনার গলার স্বর খারাপ, অভিনয়ের প্রতিভা আপনার নেই। কিন্তু তাহলেও থিয়েটারে যোগ দিয়ে উপযুক্ত লোকের কাছ থেকেই তা জানা ভালো, অনুপযুক্ত লোকের কথায় কান পাতা ঠিক হবে না। সময়ের অপব্যয়ের কথা বলবেন জানি। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই, এর পরেও বহু সময় হাতে থাকবে। অপচয়ের ভয়ে নিজেকে সঙ্কুচিত করবেন না। জীবন যে ধনী, অপচয়ের দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। অতএব ভাবনা কী? একেবারে নির্ভুল জীবনযাপনের চেষ্টা ভালো নয়। প্রাণশক্তির অভাব ঘটে বলে তাতে জীবনে মর্চে পড়ে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের কথায়ই আপনি কান পাতবেন, অভিজ্ঞতাহীনদের কথায় নয়। আপনি আপনার পথটি অনুসরণ করে চললে মুরব্বিরা একদিন-না-একদিন আপনাকে সমর্থন করবেনই—আপনি যত দেরিতে ভাবছেন তার বহু পূর্বেই। সুতরাং মাভৈ, নিষেধের কথা ভেবে না-হক নিজেকে বিচলিত করবেন না।

আপনি কি জানেন না, সমাজ-মরু সবসময়ই প্রতিভা-তরুর রস শুষে নিতে চায়; যখন পারে না, তখন শত নির্যাতন সত্ত্বেও তরুটি ফুল ফোটায়, তখনই সে বলে ওঠে : দেখ দেখ কেমন ফুল ফুটিয়েছি। যেন এই ফুল ফোটানোর বাহাদুরিটা তারই। সমাজের মতো বেহায়া আর কে আছে? আপনি যে-পথে চলতে চেয়েছিলেন সে-পথেই চলুন। দেখবেন সার্থক হলে পরিবারের লোকেরা আপনাকে গলার মালা করেই রাখবেন, না হলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

কিন্তু সার্থক না হলেই যে আপনার জীবনটা বরবাদে গেল তা নয়। বরং আপনার মতো ব্যর্থলোকেরাই সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলে। যে সমাজে যত ব্যর্থলোকের বাস সে সমাজ তত

ধনী। কেননা, ব্যর্থতার কথাটাই সাধনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ব্যর্থলোকের সংখ্যা কম বলেই তো বাংলার মুসলমানসমাজ ব্যর্থ হল, বেশি বলে নয়। এ সমাজে–যে ব্যর্থলোকের সংখ্যা কম আশা করি কেউই তা অস্বীকার করবে না। আপনি কী বলবেন জানিনে, অমি তো দুচারটির বেশি দেখতে পাইনে। আপনি হয়তো বলবেন, কী বললেন? বাংলার মুসলমানসমাজে ব্যর্থলোক নেই? হায় আল্লা, আপনি অন্ধ, একেবারেই অন্ধ! আর আপনার অন্ধতার গোড়ায় রয়েছে আপনার রোমান্‌টিসিজ্‌ম। রামান্‌টিসিজ্‌মের হিপ্‌নটিজমে মুগ্ধ আছেন বলেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না; নইলে বলেন বাংলার মুসলমানসমাজে ব্যর্থলোক নেই, থাকলেও দুচারটি? না, আপনার সঙ্গে তর্ক বৃথা, আপনি একেবারে অবাস্তব। নইলে গরিবদের হাহাকারের কথা, আশান্বিত কর্মচারীদের নিরাশ হওয়ার কথা, নিশ্চয়ই জানতেন। কত লেক্‌চারার–যে প্রফেসর, কত প্রফেসর–যে প্রিন্‌সিপ্যাল, কত প্রিন্‌সিপ্যাল–যে ডাইরেক্টর বাহাদুর হতে পারলেন না তার খবর রাখেন কি? রাখলে বাংলার মুসলমানসমাজে ব্যর্থলোক নেই, এমন কথা কখনো মুখে আনতেন না। চারিদিকে যেখানে ব্যর্থতা জড়ানো সেখানে ব্যর্থলোক দেখতে না–পারার মতো অন্ধতা আর কী হতে পারে?

আমি বলব, আপনি যে ব্যর্থতার কথা বলেছেন সে ব্যর্থতার প্রতি আমার দৃষ্টি নেই। পাকিস্তান হওয়ার পরে যেসব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার, কমিশনার গভর্নর হতে না পেরে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছেন তাদের প্রতি আমি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু আমি তাঁদের ব্যর্থতার কথা বলছিনে, বলছি সাধনার ব্যর্থতার কথা। সত্য সুন্দর বা কাল্পনিক কল্পনার ফলে যে ব্যর্থতার আবির্ভাব হয় সে ব্যর্থতার কথা।

সাধনা বাইরের দিকে ব্যর্থ হলেও ভেতরের দিকে কোনোদিন ব্যর্থ হয় না। বামন হয়ে যারা চাঁদের দিকে হাত বাড়ায় চাঁদের আলো কিছু–না–কিছু তাদের চিত্তে লেগে থাকেই। চাঁদকে তারা হয়তো পায় না, কিন্তু চাঁদের আলোকে পায়। যারা একটা বড় জিনিস চেয়ে ব্যর্থ হয়, তাদের অন্তরে সেই বড় জিনিসের ছাপ না–থেকে পারে না। তাই ছোট ব্যাপারে সার্থকতার চেয়ে বড় ব্যাপারে ব্যর্থতা অনেক ভালো। তাতে করে মানুষটি বড় হয়—তার ভেতরের কালিমা-কলুষ দূরীভূত হয়ে সে সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর এই ধরনের সুন্দর মানুষের সংস্পর্শে এসেই সমাজ সভ্যতা–সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। তাই বলেছি যে–সমাজে যত ব্যর্থলোকের বাস সে–সমাজ তত ধনী। (যে বনে যতবেশি ঝরা ফুল সে বনে ততবেশি বসন্ত এসেছে মনে করতে হবে।) ব্যর্থলোকের সংখ্যা বাড়ার মানে কী? যারা সৌন্দর্যকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া, যারা প্রেমকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া, যারা সত্যকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া, এক কথায় যারা সংস্কৃতিকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া।

সাধনার দ্বারা সোনা হতে চেয়ে যদি আপনি ব্যর্থকাম হন তো তাতে দুঃখ নেই। কেননা, সোনা না হলেও আপনি কষ্টিপাথর হবেনই। আর সংস্কৃতিক্ষেত্রে কষ্টিপাথর হওয়াটাও কম কথা নয়। কষ্টিপাথর হওয়ার দরুন সোনা কী চিজ তা আপনি সহজেই বলতে পারবেন। তাই সভ্যতা-সৃষ্টির ব্যাপারে আপনার মূল্য অনেক—এমনকি প্রতিভাবানের চেয়েও বেশি। বেল সাহেব যখন বলেন, সভ্যতা প্রতিভার সৃষ্টি নয়, সমজদারির সৃষ্টি তখন ঠিকই বলেন। যে–

সমাজে সমজদারি যতবেশি সে-সমাজ ততবেশি সভ্য। সমজদারি মানে মূল্যবোধ। মূল্যবান শিল্প রচনা করলেও সব প্রতিভাবান মূল্যবোধের পরিচয় দেয় না। আর্ট সৃষ্টি করলেও অনেক সময় তা প্রাকৃতই থেকে যায়, আর্ট হয় না। তাদের রচনার পশ্চাতে থাকে একটা অন্ধ প্রেরণা, চক্ষুষ্মান প্রচেষ্টা নয়। সমজদারের বেলা কিন্তু বড় হয়ে ওঠে চক্ষুষ্মান প্রয়াস। সে যা হতে চায় তাই হয়, অন্ধ প্রেরণার তাগিদে কিছু হয় না। প্রতিভাবান একতরফা, একঝোঁকা, সমজদার বহুভঙ্গিম। বহু প্রতিভাকে হজম করেই সমজদার সমজদার। সে স্রষ্টা না হলেও ভোক্তা, ভোজ্যদ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন। প্রতিভাবানদের অনেক সময়ই সে চেতনা থাকে না। কাজেই প্রতিভা প্রকাশ করতে গিয়ে যদি আপনি ব্যর্থ হন তো তাতে বিশেষ দুঃখ নেই। কেননা, পরিণামে আপনি সমজদার হবেনই, আর সমজদার না হলেও নয়, হলেই সমাজের লাভ।

(প্রতিভাবান যে কখনো সমজদার হয় না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। হয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ আর কটি জন্মে? বেশিরভাগ প্রতিভাবানই তো সৃষ্টিমুহূর্তে মহান, পরমুহূর্তে সাধারণ। তারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য কী বস্তু তা বলতে পারে না। তাই শিল্পী হলেও জীবনশিল্পী তারা হতে পারে না।) মানুষের দুটো ক্ষমতা—নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রতিভাবানের, সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রসিকের বা সমজদারের। নাড়া দেওয়ার ক্ষমতার অনুশীলনেই জীবন শিল্পমণ্ডিত হয়।

জীবনের দুটো শক্তি—নাড়া দেওয়ার শক্তি, আর সাড়া দেওয়ার শক্তি। নাড়া দেওয়ার শক্তি প্রতিভাবানের আর সাড়া দেওয়ার শক্তি সমজদারের। সাড়া দেওয়ার শক্তিটা খোদাদাদী, সমজদারের শক্তিটা সাধনা-লভ্য।

সমজদারি মানে মূল্যবোধের অনুশীলন। পিতার ধনে পোদ্দারি করার সুযোগ পায় না বলে সমজদারদের মূল্যবোধের অনুশীলন করতে হয়। তাদের সাধনায় সমাজে মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়ে। সেটা একটা মন্দ-নয় ধরনের লাভ নয়, বিশেষ লাভ। এরই ফলে সমাজ সাধ্যানুসারে ক্ষমতা লাভ করে। মানুষের চলার পথটি সহজ করে দেওয়া নয়; কঠিন পথটি আনন্দময় করে তোলাই তার কাজ। শ্যামের বাঁশির দিকে কান রেখে পথের কাঁটা দলে চলার কায়দাটি সে বাতলে দেয়।

অধুনা সমজদারি কথাটা ক্রিয়েটিভিটির চেয়ে কম মূল্য পেলেও, আসলে কম মূল্য নয়! একটু তলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে, সমজদারির হাতেই আত্মউৎকর্ষের ভার, ক্রিয়েটিভিটির হাতে নয়। ক্রিয়েটিভিটির হাতে কেবল আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা। ভেতরে যা আছে তা বাইরে ঠেলে প্রকাশ করে দাও, এই তার হুকুম, ভেতরটা মেজেঘষে সুন্দর ও অনাবিল করে তোলো, অন্তরাত্মার পুষ্টিসাধন করো, এমন কথা সে বলে না। এই যে ভেতর থেকে বাইরে প্রকাশের তাগিদ এরই ফরাসি নাম 'এলাঁভাইট্যাল'। বর্তমান জগৎ এরই প্রভাবে গতিচঞ্চল। প্রগতি এরই সন্তান। কেবল ব্যস্ততা, কেবল তাড়াহুড়া, কেব্‌ল ঠেলাঠেলি, অন্তরে কোনো গভীরতর প্রাপ্তির তাগিদ নেই। তাই, হালে কালচারের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ক্রিয়েটিভিটি কথাটা। গল্প কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির দ্বারা সকলেই মানুষকে চমকে দিতে চায়,

শিল্পসাহিত্যের প্রভাবে এসে নিজেকে সুন্দর ও মহান করে তুলতে চায় কম লোকই। আত্মমার্জিতির দিকে নয়, আত্মপ্রকাশের দিকেই সকলের ঝোঁক। সকলেই চায় প্রতিষ্ঠা। বছর বছর অজস্র পুস্তক প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও-যে মানুষের তেমন উন্নয়ন হচ্ছে না তার হেতুও এখানে। মানসভাণ্ডার পূর্ণ করে দেওয়ার দিকে ঝোঁক নেই বলে অধুনা মানুষের অন্তর জীবনটা ফাঁকা ও ফাঁপা হয়ে পড়ছে। গভীর অনুভূতিতে মূক হয়ে যাওয়ায়, নীরবতার গানে কান পাতার প্রবৃত্তি কারো ভেতরেই নেই। সকলেই চায় কেবল দিতে, নিতে নয়। প্রশংসালোলুপ লেখক আর পাঠকে সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে। সকলের মুখে কেবল বিশ্বের কথা; নিজের কথা, নিজের অন্তরাত্মার কথা কেউ আর বলে না। কিন্তু যতই আমরা বিশ্ব-বিশ্ব করছি, ততই-যে অন্তরের দিক দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছি, সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। বিশ্ববুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্তরের নিঃস্বতা ঢাকবার একটা উপায়, এমনি মনে হয়। গভীরতর প্রাপ্তির দিকে নজর নেই বলে রাজনীতির মতো সংস্কৃতি জিনিসটাও হইচই চর্চা হয়ে পড়েছে। সেখানেও দেখা দিয়েছে বুলিসর্বস্বতা। একটা আইডিয়ার প্রতিধ্বনি হয়ে চিন্তার বালাই থেকে মুক্তি পাওয়াই অধুনাতন সংস্কৃতির উদ্দেশ্য।

তাই পুঁথির প্রতাপ দেখে যখন মোহিতলাল শঙ্কিত হন তখন তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই বলার থাকে না। সত্যিই তো পুঁথি আজ জগদ্দল শিলার মতো মানুষের বুকের ওপর চেপে বসেছে, তার অন্তর বিকাশে সহায়তা করছে সামান্যই। ভূমাপ্রীতি তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য কেবল খণ্ডজ্ঞানে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করে তোলা। তাই আত্মার উজ্জীবন আর হয় না। লেখক কি পাঠক কেউই রূপান্তর কামনা করে না, সকলেই চায় শক্তির জলুস দেখিয়ে বাহবা পেতে। পাঠকদের যে গ্রহণ তাও যেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই। কথা বলে লোককে চমকে দেওয়ার জন্যেই তারা বই পড়ে, আত্মপুষ্টির জন্য নয়। বই পড়ার দরুন বুদ্ধিরই কসরত হয়, আত্মার অনুশীলন হয় না। মুখে মুখে আধুনিক ইন্‌টেলেকচুয়াল বুলি, ভেতরে একটা ছদ্মবেশ, অসভ্যতার ওপর সভ্যতার পলেস্তারা। সকলেই চায় বিশ্বকে পরিবর্তিত করতে, নিজের রূপান্তরের দিকে কারোই ঝোঁক নেই। অথচ বিশ্বের চেয়ে নিজের ওপরই যে আমাদের অধিকার বেশি, নিজেকেই যে সহজে বদলানো যায়, সে কথাটা আমাদের মনে থাকে না। নিজেকে নীরবে ফুলের মতো বিকশিত করে তোলার আনন্দ আজ আর কেউ চায় না, সকলেই চায় সমারোহ প্রকাশ। করার দিকেই সকলের ঝোঁক, হওয়ার দিকে নয়। অথচ কাল্‌চারের উদ্দেশ্য-যে কিছু করা নয়, কিছু হওয়া—সুন্দর হওয়া, প্রেমিক হওয়া, নবীন হওয়া —এ-তো একরকম অবিসংবাদিত সত্য।

কিন্তু সচরাচর এই সত্যের প্রতি নজর রাখা হয় না বলে একপ্রকার সস্তা সংস্কৃতিতে জীবন ছেয়ে যায়। তাতে থাকে কেবল বুদ্ধির চটক, আত্মার গভীরতা নয়। তাই তা দিয়ে জীবনের দীনতা দূর হয় না। পুস্তক-বাহুল্যের দরুন এই-যে সস্তা সংস্কৃতি, এর অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি গ্যেটে বহুপূর্বেই ইঙ্গিত করেছেন :

> আমরা যে-যুগে বাস করছি, তাতে প্রকর্ষ এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, তরুণরা সেসব পাচ্ছে যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজভাবে। কাব্য-দর্শন বিষয়ক চিন্তা আন্দোলিত হচ্ছে

> তাদের মধ্যে, তারা সেসব গ্রহণ করছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, মনে করছে সেসব তাদের নিজস্ব সম্পদ, প্রকাশও করছে সেসব সেই ভঙ্গিতে। কিন্তু যুগের কাছ থেকে যা পেয়েছে তা যখন ফিরিয়ে দিচ্ছে সেই যুগকে, তখন তারা হয়ে পড়ছে নিঃস্ব। তারা যেন ফোয়ারা, কিছুক্ষণের জন্য চলে তাতে জলের খেলা কিন্তু জল নিঃশেষিত হবার সঙ্গে হয় তার শেষ।*

আমাদের বেলাও তাই ঘটছে। যুগের জিনিস যুগকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরে আমরাও নিঃশেষিত হয়ে পড়ি। গভীরতর প্রাপ্তির দিকে নজর নেই বলেই এমনটি ঘটে। নইলে জীবন এমন ফাঁকা হয়ে পড়ত না।

এই ধরনের বুদ্ধিসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য মানুষের দিকে তাকিয়ে গ্যেটে যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি করেছেন তাও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেছেন :

> মানুষ আরো সচেতন আরো কুশাগ্রবুদ্ধি হবে; কিন্তু থাকবে না তাদের মহত্ত্ব, সুখ, কর্মদক্ষতা; যদিও থাকে তবে বিশেষ বিশেষ যুগে। এমনকালের কথা ভাবতে পারি যখন ঈশ্বর মানুষে আর কোনো আনন্দ পাবেন না। তখন সব ভেঙেচুরে তিনি গড়বেন নতুন করে।**

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার জীবন উপভোগ করবার জন্য। যদি উপভোগনীয় কিছুই না রইল তবে তাকে আর রেখে কী লাভ? আল্লাহ্ উপভোগ করেন মানুষের ভেতরের বেদনশীলতা; আর তা বুদ্ধির ব্যাপার নয়, আত্মার ব্যাপার; তাই আত্মার তাগিদ তথা সৌন্দর্যের তাগিদ। মহত্ত্বের তাগিদ যখন ফুরিয়ে যায় তখন মানুষে আর আল্লাহ্‌র রুচি না-হওয়ারই কথা। আল্লাহ্ বেদনাহীন তথা মহত্ত্বহীন জীবন পছন্দ করেন না।

('Man is not the last word of God' বলে একালের লেখক বার্নার্ড-শ'ও মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্যাক টু ম্যাথুশেলায়'। আর হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড'-এর অনুপম চরিত্র 'স্যাভেজ'এর সৃষ্টিও এই বেদনাহীনতার প্রতিবাদেই।)

যেখানে পশুমানুষটি তলিয়ে গিয়ে মানুষ-মানুষটি বড় হয়ে ওঠে না; যেখানে প্রতিযোগিতা, প্রতারণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি নীচপ্রবৃত্তিসমূহের জয়জয়কার; সেখানে ক্রিয়েটিভিটি থাকতে পারে, কিন্তু সমজদারি নৈব নৈব চ—হ্যরগীজ নিস্ত। রিফাইনমেন্ট সমজদারিরই দান, ক্রিয়েটিভিটির নয়। ক্রিয়েটিভিটির গায়ে অনেক সময় লেগে থাকে আদিমতার গন্ধ। তা দিয়ে বড়কিছু সৃষ্ট হলেও অনুপম কিছু সৃষ্ট হয় না। সমজদারির লক্ষ্য রূপান্তর—নিজের ভেতরের সুন্দর ও মহৎ মানুষটির উন্মোচন। যেখানে এই রূপান্তর নেই, সেখানে সমজদারি নেই; সেখানে আছে কেবল চমক লাগানো শক্তির প্রকাশ । সমজদারি তো আর ক্রিয়েটিভিটির মতো একটা হঠাৎ-আসা ব্যাপার নয় যে, জীবনের ওপর প্রভাব না-রেখে চলে যাবে। তা সাধনালব্ধ ব্যাপার আর সাধনার প্রভাব থাকেই। ক্রিয়েটিভিটি কথাটায় শক্তির প্রকাশই বড় হয়ে ওঠে, আত্মমার্জিতি নয়। সবচেয়ে বড় সৃষ্টি যে আত্মসৃষ্টি, ক্রিয়েটিভিটি-বুলিবাদীদের পক্ষে তা

---

* কবিগুরু গ্যেটে ২য় খণ্ড—কাজী আবদুল ওদুদ

** কবিগুরু গ্যেটে ২য় খণ্ড—কাজী আবদুল ওদুদ

বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাদের জীবন ও রচনা অসংস্কৃতির গন্ধমুক্ত হতে পারে না। জোয়ারের জলের মতো কোথাকার একটা শক্তি এসে তাদের তোলপাড় করে দিয়ে যায়, তারপরে যে-দীনতা সে-দীনতা। জীবনের ওপর রচনার কোনো প্রভাব থাকে না বলে তাদের জীবন আর ইতর জীবনে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। ক্ষণদ্যুতিকে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা হয় শুধু রচনায়, জীবনে নয়। তাই জীবন ফাঁকা থেকে যায়। (অথবা ভুল বলেছি, জীবন কোনোদিন ফাঁকা থাকে না, আল্লাহ্ না থাকলে সেখানে শয়তান থাকেই, সুন্দর না থাকলে তা অসুন্দরের আস্তানা হয়ে পড়েই।)

সমজদারদের কিন্তু ভিন্নধারা। অপরকে চমকে দেওয়া নয়, নিজেকে খুশি ও সুন্দর করাই তাদের উদ্দেশ্য। তা বিনয়ের সন্তান, অহমিকার নয়। নিজের কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্যে পীড়া বোধ করা সমজদারিরই পরিচয়। অপরেরা যেখানে গর্বে মাথা উঁচায়, সমজদাররা সেখানে লজ্জায় অধোবদন হয়। মিথ্যা ঔজ্জ্বল্যে তারা তৃপ্ত হতে চায় না, ফাঁকি দিয়ে স্বর্গ কিনতে তারা নারাজ। তারা চায় খাঁটি জিনিস। 'কৃত্রিমপণ্যে'-যে জীবনের পসরা ব্যর্থ হয়ে যায় তা তারা সবচেয়ে ভালো বোঝে।

বলেছি, সমজদারি ব্যর্থতার দান; প্রতিভা প্রকাশ করতে গিয়ে যারা ব্যর্থ হয় সাধারণত তারাই সমজদার হয়। অকৃতকার্যতাটা এখানে শাপে বর হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যর্থতা জিন্দাবাদ না বলে উপায় নেই। ব্যর্থতার দিকে মানুষকে ডাকুন, সমাজ সমৃদ্ধ হবে। বড় কাজে হাত দিয়ে যারা ব্যর্থ হয় তারাই তো সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার : সমজদারও সৃষ্টি করে; কিন্তু সে বই নয়, শিল্প নয়, নিজের অন্তরাত্মা; আর অন্তরাত্মার চেয়ে বড় সৃষ্টি আর কী হতে পারে?

না, ব্যর্থতাকে ভয় করবেন না। সাহিত্যশিল্পের পথে পা বাড়ানো কি ব্যর্থতার পথে পা বাড়ানো নয়? ও-পথে সার্থকতা লাভ করে আর কটি লোক? কিন্তু যারা ব্যর্থ হয় তাদের জীবনেও এমন একটা মূল্যবান জিনিসের আবির্ভাব হয় যা না হলে সমাজ-সভ্যতা সংস্কৃতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। এ ধরনের ব্যর্থলোকের দ্বারাই সমাজে নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়। পলিমাটি ফেলে-ফেলে এরাই সমাজকে উর্বর করে দিয়ে যায়, তাই এদের মূল্য অনেক। শুধু ঢাউস নামের অধিকারীদের মনে রাখা তো অনেক সময় একপ্রকারের মোহ, সত্যকার সচেতনতার পরিচয় দেওয়া হয় এদের মনে রাখলেই।

এই-যে সমজদার-সম্প্রদায়, এরা খুশি হওয়া আর খুশি করার মন্ত্রে দীক্ষিত। এদের সাধনা দুঃখ ভুলবার সাধনা, দুঃখ দূর করবার সাধনা নয়। মন ভোলাবার মন্ত্র এরা জানে। একটা বড়কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করে এরা নিজেদের অবিক্ষুব্ধ রাখে।

পরিশিষ্ট

ওপরে যে-গতির কথা বলা হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে। গতিকে না মানলে হয়তো চলে না, জীবনের জড়ত্ব ঘোচাবার ক্ষমতা তারই হাতে। কিন্তু অসহায়ের

মতো কেবল গতিকে মানলে জীবনে কর্তৃত্ব থাকে না। গতির মধ্যে স্থিতিকেও জানতে হবে। আর তা সম্ভব হয় চিরন্তনকে উপলব্ধি করলেই। শিল্পী-সাহিত্যিকরা তা-ই করেন। গতি থেকে চিরন্তনকে ছিনিয়ে নিয়ে রূপায়িত করাই এঁদের কাজ। আর রূপায়ণ মানে স্থিরতা দান—'অসীমের সীমা রচনা করা।' অনন্ত কালপ্রবাহ এই-যে স্থির ধ্রুবতারাবৎ সৃষ্টিসমূহ—এরাই সংস্কৃতির উপাদান। এদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েই আমরা মূল্যবোধের পরিচয় দেই।

কালপ্রবাহ অনবরত বয়ে চলেছে। বিরতিহীন তার গতি। কিন্তু এই চিরপ্রবহমান কালধারার বাধাকে অগ্রাহ্য করে এমন কতিপয় লোক আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ান, আলোকস্তম্ভের মতো নিয়ত সম্মুখে থেকে যাঁরা মানুষের পথচলাকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলেন। তাঁরাই মানব-বন্ধু। তাঁদের দানে জীবন ভরে তোলাই সমৃদ্ধি।

বুদ্ধদেব-কনফুসিয়াস-সক্রেটিস-যিশুখ্রিস্ট-হজরত মুহম্মদ, কালিদাস-হাফেজ শেক্সপিয়ার-গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ, কালের গর্জন অগ্রাহ্য করে এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ের মতো উন্নতশিরে। এঁদের উন্নতশীর্ষকে অন্তরে ধারণ করতে না পারলে 'সংস্কৃতিবান' হওয়া যায় না। তাই সংস্কৃতির জন্য অতীতের জ্ঞান এত প্রয়োজনীয়। কেবল 'বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আবেগে উল্লাসি নৃত্য করলে' সংস্কৃতি হয় না। অতীতে মানস-পর্যটন প্রয়োজনীয়। অতীতেরই একটা রূপ আছে, বর্তমানের নেই! বর্তমান চিরচলন্ত, চিরপরিবর্তমান, তাই রূপের সীমায় বাঁধা পড়ে না। অতীত রূপের সীমায় বাঁধা, সে একখানা ছবির বই। আর এই ছবির বইখানা হাতড়াতে হাতড়াতে অন্তরে যে সৌন্দর্য, যে-শ্রদ্ধা জাগে তা-ই সংস্কৃতি। (বলাবাহুল্য, এখানে অতীতের সুহৃদ্ সম্মিত রূপের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, প্রভুসম্মিত রূপের প্রতি নয়। প্রভুসম্মিত রূপ-যে অন্তরাত্মাকে চেপে রাখে, বিকশিত করে না, সে তো একরকম জানা কথা।)

এখানেই প্রগতির সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ বাধে। প্রগতি মানে কালের যাত্রাপথটি মসৃণ ও অব্যাহত রাখা। যেখানে-যেখানে অন্যায়-অবিচারের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে সমাজের সার্থক প্রকাশকে ব্যাহত করে সেখানে-সেখানে সেই আবর্জনাস্তূপ সরিয়ে দিয়ে গতিধারাকে মুক্ত করাই প্রগতির কাজ। কিন্তু শুধু তা করলেই সংস্কৃতি হয় না। সংস্কৃতি মানে কেবল কল্যাণ নয়, সৌন্দর্যও। সৌন্দর্যই বেশি। অনেক সময় অকল্যাণকে বরণ করে নিয়েই সৌন্দর্য সাধন করতে হয়। আগে কল্যাণ পরে সৌন্দর্য এমন তর্ক খাটে না।

এই সৌন্দর্যসাধনের জন্য স্থিতির প্রয়োজন। দিনের চলমান অবস্থায় যে-সৌন্দর্য চোখে পড়ে না, রাত্রের স্থির অবস্থায় তাই মানসচক্ষে ফুটে ওঠে। তখন সৌন্দর্য আমরা শুধু দেখিনে, সৃষ্টিও করি; কেননা চোখের কাজের চেয়ে মনের কাজটাই তখন বড় হয়ে ওঠে। দিনে যে-সৌন্দর্য চেতনের ওপর আলগাভাবে পরশ বোলায়, রাত্রে তাই ফুটে ওঠে অচেতনের মায়ায় উজ্জ্বল হয়ে। গ্রহ-তারা দীপ জ্বালে যেন দিনের স্মৃতিকে মধুরতর, উজ্জ্বলতর করবার উদ্দেশ্যেই। দিনে কাজ, ছুটাছুটি, রাত্রে ধ্যান, কল্পনা। রহস্যের উপলব্ধি করা যায় রাত্রেই, দিনে নয়।

তাই দরকার স্থিরতার। কি ব্যক্তির জীবনে, কি জাতির জীবনে স্থিরতার প্রয়োজন অনিবার্য। স্থিরতার মানেই একটা অবস্থাকে মেনে নেওয়া, সেই অবস্থায় দুঃখবেদনা নিয়ে

ছটফট না-করা। সার্থক নেতৃসম্প্রদায় তাই সমাজকে এমন একটি কালের তীরে এনে পৌছে দেন যেখানে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত পাওয়া যায়। নইলে কেবল প্রগতির তাগিদে চলতে আত্মহারা হয়ে পড়তে হয়। তখন সৌন্দর্য দেখার দৃষ্টি আর থাকে না। কাঁটা তোলার কাজে অতিরিক্ত রত থাকার দরুন ফুল দেখার দৃষ্টিটা বেমালুম হাতছাড়া হয়ে যায়।

(কবির 'বুত্‌শিকন'কে যে-কথাটা বলেছিলেন এখানে তা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন : হে বুত্‌শিকন তুমি-যে মূর্তি ভেঙে চলেছ তাতে তোমার ক্ষতিই হচ্ছে, কেননা তুমি কেবল মূর্তিই দেখতে পাচ্ছ, আল্লাহ্‌কে আর উপলব্ধি করতে পারছ না। তেমনি একালের প্রগতিবাদীদের সম্বোধন করে বলা যায় : হে প্রগতিবাদী সম্প্রদায়, তোমরা শুধু অন্যায়-অবিচারের কাঁটাই দেখলে—পৃথিবীপুষ্পে সৌন্দর্য আর উপলব্ধি করতে পারলে না। তোমরা দুর্ভাগ্য।)

বলাবাহুল্য এখানে প্রগতির বিরুদ্ধে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রগতি কোথায় সৌন্দর্যের গায়ে হাত তুলতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রগতি আম-দরবারের ব্যাপার, সংস্কৃতি খাস-দরবারের। আম-দরবারের দাবি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন খাস-দরবারের দাবিটা বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেটা যেন না হয়।

কাঁটা তোলার ব্যর্থতা এখানে যে, কাঁটার অন্ত নেই। একভাবে-না-একভাবে তা দেখা দেবেই। তাই কাঁটা তোলার ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন আধুনিক কবির মুখে শুনতে পাই :

ফুল্লধরার কাঁটা তুলে তুলে আঙুল রাঙাব কত,
আত্মঘাতীর মতো।

আমার ধরণী শ্যামা অপ্সরা
নাচে শিরে ধরি শোভার পসরা
কোথা রে মৃত্যু কোথা তব জরা
এ দেখা দেখিব কবে?
অন্য দেখায় কী আমার বলো হবে।*

এই-যে সৌন্দর্য দেখার দৃষ্টি, এ প্রগতির দান নয়, সংস্কৃতির দান। (ওস্তাদি গানের অনুশীলনে প্রগতির মাথাব্যথা থাকার কারণ নেই, কিন্তু সংস্কৃতির আছে।) সংস্কৃতি সৌন্দর্যভুক। প্রগতি কল্যাণভুক। তাই কাঁটা বাছার কাজে জীবন যাতে সাঙ্গ হয়ে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। মাঝে মাঝে জগতের দুঃখ-বেদনার কথা ভোলা ভালো। তাতে লাভ এই যে, নিজেকে আর কাঁটা করে তুলতে হয় না। ফলে অন্তত একটা কাঁটা থেকে জগৎ মুক্তি পেয়ে যায়।

* রাখী—অন্নদাশংকর রায়।

দুঃখবাদ

অন্যান্য কালের মতো একালেও ভাবা হচ্ছে : প্রাজ্ঞ লোকেরা যখন এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, এই পৃথিবী দুঃখময়—এখানে বাঁচবার মতো কিছুই নেই, তখন এখানে সুখ প্রত্যাশা না-করাই ভালো। যাঁদের কথা বলা হল তাঁরা যদি বৈরাগী হতেন তো এক কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা যখন নিজেরাই ভোগী-শিরোমণি তখন তাঁদের কথায় আর আস্থা স্থাপন না ক'রে থাকা যায় না। আপনি যদি সত্যি সত্যি একটা ফল মুখে দিয়ে 'থু' করে মুখ বাঁকান তো আমার আর ও-ফলটি চেখে দেখবার সাধ থাকতে পারে না। আপনার দেখাদেখি আমারও 'থু' করে মুখ বাঁকাবার ইচ্ছে হবে। অতিভোগের পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতিবানরাই যখন মুখ বাঁকান—যেন তেতো কিছু খাচ্ছেন এমনিভাবে, তখন সংস্কৃতির নতুন দাবিদাররাও যে তা-ই করতে চাইবে তাতে আর আশ্চর্য কী? সকলেই তো উঁচু নাকের পরিচয় দিতে ভালোবাসে, আর উঁচুনাকঅলা সাজবার সহজ উপায় হচ্ছে পৃথিবীতে উপভোগ করবার মতো কিছুই নেই, এমনি ভাব দেখানো।

এই ধারণার বশবর্তীরা সত্যই দুঃখী। কিন্তু সাধারণের দুঃখ আর তাদের দুঃখের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ লোকেরা তাদের দুঃখের জন্য গর্ববোধ করে না, কিন্তু তারা করে। জগতে উপভোগ্য কিছুই নেই, এ-কথা বলে তারা একটা উন্নাসিক শ্রেষ্ঠতাবোধের পরিচয় দেয়। তাদের গর্ব দেখে সাধারণের মনে একটা খটকা লাগে : 'দুঃখের জন্য গর্ব', তা আবার কীরকম ব্যাপার? এ তো 'সোনার পাথরবাটি'র মতো একটা অসম্ভব কিছু। হয় তাদের গর্বটা মিথ্যা, নয় দুঃখটা—এই তাদের সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায়। সত্যি-কথা। দুঃখের মধ্যে যে আনন্দ পায়, তার আবার দুঃখ কিসের? তার শ্রেষ্ঠতাবোধের মধ্যেই তো একটা ক্ষতিপূরক দিক রয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাকেই যথেষ্ট বলা যায় না। অহঙ্কারবোধ যে-সুখের যোগান দেয়, প্রকৃত সুখের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর।

নিজেকে দুঃখী ভেবে গর্ববোধ করার মধ্যে কোনোপ্রকার উন্নত ধরনের যৌক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না। তা বিকৃত বুদ্ধিরই পরিচায়ক। দুঃখের জন্য গর্ব না করে বুদ্ধিমান মানুষ যতটা সম্ভব সুখ আদায় করে নিতে চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তারা যদি মনে করে জাগতিক চিন্তা একটা সীমা পেরিয়ে গেলেই সুখের কারণ না হয়ে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো তারা জগতের চিন্তা না করে অন্য কিছুর চিন্তা করবে। মোটকথা, সুখের দিকেই তাদের ঝোঁক হবে, দুঃখের দিকে নয়। 'দুঃখই সত্য' এ-কথা প্রমাণ করতে গিয়ে যারা বিশ্বপ্রকৃতির মূলেই দুঃখের নিদান দেখতে পায়, তারা প্রকৃতপক্ষে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাবার চেষ্টা করে। আসল ব্যাপারটি এই যে, নিজের দুঃখের কারণটি বের করতে না-পেরে তারা শেষে বিশ্বপ্রকৃতির ওপরেই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে-সকল নৈরাশ্যব্যঞ্জক দিক রয়েছে তাদের

উপর আঙুল রেখে বলে : বিশ্বের মূলেই যখন নিষ্ঠুরতা, তথা দুঃখের খেলা তখন তার থেকে সুখ প্রত্যাশা না-করাই যুক্তিসঙ্গত। এসো, সুখের কামনা ভুলে গিয়ে নিজেকে দুঃখের জন্য প্রস্তুত করে তুলি; তা হলেই আর প্রবঞ্চিত হওয়ার ভয় থাকবে না। মিথ্যা খেয়ালি পোলাও খাওয়ার চেষ্টা না করে যা সত্য, নিষ্ঠুর হলেও তাকে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

ওপরে যে-দুঃখবাদী দর্শনের উল্লেখ করা হল, আমেরিকার পাঠকদের জন্য তা পরিবেশন করেছেন জোসেফ উড্ ক্রুচ্ তাঁর 'দি মডার্ন টেম্পার' নামক গ্রন্থে। আমাদের পিতামহদের জন্য তা পরিবেশন করেছিলেন কবি বাইরন। আর সমস্ত কালের লোকদের জন্য তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'ইক্লেজিয়েট্সে'র লেখক। ক্রুচ্ বলেছেন :

> আমাদের কোনো ভরসা নেই। প্রাকৃতিক বিশ্বে আমাদের জন্য এতটুকু সুখের স্থানও নেই। তথাপি মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে আমরা দুঃখিত নই। পশু হিসেবে বাঁচার চেয়ে মানুষ হিসেবে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

আর বাইরন যা বলেন তা তো সকলের জানা :

> যে আনন্দ নিয়ে যায় কাল, কভু নাহি দেয় তাহা ফিরে,
> যৌবনের ভাবের গরিমা ডুবে কাল-যায়-সিন্ধু-নীরে।"

এখন ইক্লেজিয়েট্সের লেখকপ্রবর কী বলেন, দেখা যাক। তিনি বলেন :

> এইজন্যই আমি বেঁচে-থাকা মানুষদের চেয়ে মরে-যাওয়া মানুষদের অধিক গুণকীর্তন করি। হ্যাঁ, তাঁদের চেয়েও ভালো হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা এখনও জন্মাননি। এবং সেহেতু সূর্যের আলোর নিচে যেসব মন্দ ব্যাপার ঘটে তা প্রত্যক্ষ করেননি।"

এই অশুভদর্শী ব্যক্তিত্রয়ের প্রত্যেকে প্রচুর সুখভোগের পরেই এই নিরানন্দ দর্শনে এসে পৌঁছেন। ক্রুচ্ বাস করেছিলেন নিউইয়র্কের সুখভোগী ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে। বাইরন সাঁতরে ছিলেন ভোগের নদী। ইক্লেজিয়েট্সের রচয়িতাও ভোগের ব্যাপারে কম যাননি। সুরা, সঙ্গীত ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না বললেই চলে। দাস-দাসী ছিল তাঁর বিস্তর, সরোবরও তিনি খনন করিয়েছিলেন। ভোগের আয়োজনে কোনোকিছুই তিনি বাকি রাখেননি ! তথাপি তিনি দেখতে পেলেন সকলই ফাঁকি, মায়া—এমনকি জ্ঞানও।

> আর আমি জ্ঞান-আহরণে মনোনিবেশ করলুম, নির্বোধ মমতায় জীবনের স্বাদও নিলুম। কিন্তু ততঃ কিম? তাতে তো আত্মার বিক্ষোভই বাড়ে, কমে না। কারণ যতবেশি জ্ঞান বাড়ে, ততবেশি দুঃখও বাড়ে। জ্ঞান বাড়িয়ে তুমি দুঃখই বাড়াও।

মনে হয়, তাঁর জ্ঞান তাঁকে ঘাবড়ে দিয়েছিল। জ্ঞান, প্রেম, ভোগবিলাস সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে ফাঁকি, অন্তঃসারশূন্য বোধ হল বলে জীবন তাঁর কাছে ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি দুঃখকেই মানব-ভাগ্য বলে মেনে নিলেন।

এখন এই-যে মনোভঙ্গি, এ সচেতন বুদ্ধিলোকের ব্যাপার নয়, অবচেতন ভাবলোকের ব্যাপার। অর্থাৎ এটি চিন্তার বিষয় নয়, 'মুড' বা মনোভাবের বস্তু। তাই এর পরিবর্তন ঘটতে পারে কেবল কোনো শুভ ঘটনার সংযোগে অথবা শরীরগত পরিবর্তনে—তর্ক করে কখনো নয়। জীবন অনেকদিন আমার কাছেও ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়েছে। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা

থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি কোনো ফিলজফি পড়ে নয়—অনিবার্য কর্মপ্রেরণায়। আপনি যতই অবসাদ বোধ করেন না কেন, এমন সময় আসবেই যখন আপনি কাজ না করে থাকতে পারবেন না, আর কাজের সঙ্গে সঙ্গে আপনার অগোচরেই আপনার অবসন্নতা বাষ্পের মতো মিলিয়ে যাবে। সূর্য যেমন মেঘের শত্রু, কাজও তেমনি অবসাদের দুশমন। আপনার ছেলে যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তো নিশ্চয়ই আপনি দুঃখবোধ করবেন, কিন্তু আপনার কাছে জগৎ অসার মনে হবে না। বরং জীবনের মূল্য আছে কি নেই, এ-কথা না-ভেবেই আপনি আপনার ছেলেকে সারিয়ে তুলতে চাইবেন। সত্যকার দুঃখীরা জীবনকে কোনোদিন ফাঁকি মনে করে না। জীবনের প্রতি আকর্ষণ তাদের ষোলো আনা। 'জীবন ফাঁকি' বলার প্রবণতা রয়েছে শুধু অবসরভোগী ধনী-সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু ধনীলোকটি যদি ভাগ্যের চক্রান্তে সর্বস্ব খুইয়ে বসে তো পরের বেলার আহারটুকুকে সে আর ফাঁকি বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না। জীবনের চাহিদাগুলি সহজে মিটলেই এ-ধরনের রুগ্ণ মনোভাবের জন্ম হয়। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষের জন্যও জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজন আছে। প্রচুর ধনাগমের ফলে মানুষ যখন সহজে, একরকম বিনা চেষ্টায়ই তার খেয়াল মেটাতে সক্ষম হয়, তখন সে আর জীবনের স্বাদ পায় না। চেষ্টার অভাবের দরুন সুখের উপাদানে ঘাটতি ঘটে। 'আকাঙ্ক্ষার পূর্তিতে সুখ নেই'—এ উক্তি কেবল তারই হয়ে থাকে, কামনার বস্তুগুলি যে অত্যন্ত সহজে পায়। এই লোকটি যদি দার্শনিক গোছের হয় তো সহজে এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে যে, যে-ব্যক্তিটি অনায়াসেই তার শখ মেটাতে পারে সে-ই যখন সুখী নয়, তখন দুনিয়া স্বভাবতই দুঃখের। কোনো কোনো প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবই-যে সুখের হেতু, এ-কথাটা হতভাগ্য দার্শনিকটির মনে থাকে না।

এ গেল 'মুড' বা মনোভাবের ব্যাপার। যুক্তি-তর্কের ব্যাপারও ইক্লেজিয়েট্সে আছে। ইক্লেজিয়েট্স-কার জীবনের অসারতা সম্বন্ধে যে-মতটি ব্যক্ত করেছেন, হালের দার্শনিকদের হাতে তা নিম্নরূপ অভিব্যক্তি পেত :

মানুষ অনবরত খেটে চলেছে, বস্তুও এক অবস্থায় স্থির হয়ে নেই। তথাপি এমন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না যা চিরত্ব দাবি করতে পারে। বড় রকমের কোনো পরিবর্তনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্বের ব্যাপারের সঙ্গে পরের ব্যাপারের পার্থক্য অল্পই। সেই থোড়-বড়ি খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। মানুষ মরে যায়, ছেলে এসে তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। আবার তার ছেলে তাকে অনুসরণ করে। নদী সমুদ্রের দিকে যায়, কিন্তু সেখানেও তার জল আটকে থাকে না—কেবলই সরে সরে যায়। বারবার উদ্দেশ্যবিহীন চক্রে মানুষ ও বস্তু ঘুরছে। অন্তহীন, পরিণতিহীন এই ঘূর্ণন। এতে কী লাভ? নদী যদি বুদ্ধিমান হত তো সে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকত—চপলতা দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেত না। সোলেমান যদি বুদ্ধিমান হতেন তো ছেলের ভোগের জন্য গাছ লাগিয়ে যেতেন না। বুদ্ধিমান লোকের কাছে সব ফাঁকি সব মায়া। এই ফাঁকির ফাঁদে ধরা দেয় কেবল বোকারাই। অতএব, নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা যদি প্রতিপন্ন করতে চাও তো ও-পথ মাড়িও না। অবজ্ঞা করো, পৃথিবীকে অবজ্ঞা করো—ফিরেও তার দিকে তাকিও না।

কিন্তু অন্যভাবে দেখতে গেলে পৃথিবী কত সুন্দর, কত বিচিত্র। কত নিত্যনতুন ব্যাপার ঘটছে এখানে। সূর্যের নিচে নতুন কিছু নেই, না? তাহলে এই-যে আকাশ-ছোঁয়া ইমারত, উড়োজাহাজ,

বেতারবার্তা—এসব কী? সোলেমান এসবের কী জানতেন? মনে করুন, শেবার রানী তাঁর শাসনাধীন দেশসমূহ থেকে ফিরে এসে রেডিওর মারফত প্রজাদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সোলেমান তা শুনে কি খুশি হতেন না? না, তাও তাঁর কাছে বৃক্ষ ও পুকুরের মতো একঘেয়ে মনে হত? তাঁর কালে খবরের কাগজেরও চল ছিল না। কেউ যদি তাঁকে সংবাদপত্র থেকে তাঁর হারেম ও ইমারতের প্রশংসা-বাণী, অথবা তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষিকুলের নাজেহাল হওয়ার কথা পড়ে শোনাতেন, তাহলে কি তিনি জীবনের নতুনতর স্বাদ পেতেন না? না, তাও তাঁর কাছে জলো, অর্থবিহীন মনে হত? অবশ্য নৈরাশ্যবাদ দূর করবার জন্য এগুলিই যথেষ্ট নয়, এদের বর্তমানেও তা থেকে যেতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে হয়েছেও তাই। ইক্‌লেজিয়েট্‌স্-রচয়িতা মুখ কালো করেছিলেন নতুনত্বের অভাব দেখে, ক্রুচ্‌ করেছেন নতুনত্বের প্রাচুর্যের দরুন। দুই বিপরীত কারণ একই ব্যাপারের জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং বুঝতে পারা যায়, কারণ হিসাবে তারা তেমন জোরালো নয়। নদী পড়ে গিয়ে সমুদ্রে, তথাপি সমুদ্র যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে, তার বৃদ্ধি হয় না; জলধারা যেখান থেকে আসে সেখানেই আবার ফিরে যায়।—এটা যদি একটা দুঃখের কারণ হয় তো ভ্রমণে কেউ আনন্দ পেত না। লোকেরা গরমের দিনে হাওয়া-বদলে যায় গরমের শেষে আবার ফিরে আসতেই। তাই বলে হাওয়া-বদলটা দুঃখজনক, এমন কথা তো কেউ বলে না! বরং তা থেকে আনন্দই পাওয়া যায়। জলধারার যদি অনুভব-ক্ষমতা থাকত তো এই ঘূর্ণনে সে শেলীর মেঘের মতো আনন্দই বোধ করত, দুঃখ নয়। জীবনের স্পন্দনই বড় কথা। বরাবরই একটি ব্যাপার ঘটলেও তা যদি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হয় তো তাকে আর বিরক্তিকর মনে হয় না। ভবিষ্যতের সুপরিণতির দিকে তাকিয়ে বর্তমানের বিচার করা ভুল। বর্তমানের নিজেরই একটা মূল্য আছে। অংশগুলির মূল্য না থাকলে সমগ্রেরও কোনো মূল্য থাকতে পারে না। জীবন আর যাই হোক, 'মেলোড্রামা' নয়। মেলোড্রামা হাজার দুঃখ-বিপদের মধ্য দিয়ে গিয়েও পরিণামে একটা সুপরিণতি তথা নায়ক-নায়িকার মিলন চোখে পড়ে। জীবনে তেমনটি হয় না। হলে তা একটা কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। জীবনে কেবল সুপরিণতিরই মূল্য নেই, প্রতিটি মুহূর্তেরও মূল্য রয়েছে। আমার কালটি আমি ভোগ করলুম, আমার ছেলে তার কালটি ভোগ করবে, তারপর তাকে অনুসরণ করবে তার ছেলে—এই তো জীবন, এ-কথা বলে উন্নাসিকতা প্রদর্শনের কী আছে? বরং চিরকাল বেঁচে থাকলেই তো জীবনের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা কমে আসে। ফলে পরিণামে জীবন বোঝার মতো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

জীবনের আঁচে তপ্ত করেছি দুহাত ভাই
আগুন নিভিছে, এবার আমিও বিদায় চাই।

নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোবৃত্তির মতো এ মনোবৃত্তিও যুক্তিসঙ্গত বটে। তাহলে দেখতে পাওয়া যায়, যুক্তি কেবল নৈরাশ্যবাদের পক্ষেই নয়, আশাবাদের পক্ষেও রয়েছে।

ইক্‌লেজিয়েট্‌সের দুঃখের কারণ দেখলুম। এবার ক্রুচের দুঃখের কারণটা কী, ভেবে দেখবার চেষ্টা করছি। ক্রুচের দুঃখের গোড়ায় রয়েছে শাশ্বত আদর্শের অভাব। মধ্যযুগে, এমনকি আধুনিককালের শুরুতেও যে-সকল আদর্শের জন্ম হয়েছিল, তা আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তিনি দুঃখিত। তাঁর মতে, আধুনিককালের সংকট আর যৌবন-উন্মুক্ত অবস্থায় সংকট

প্রায় এক পর্যায়ের। যৌবন-উন্মুখ অবস্থায় যেমন মানুষ ছেলেবেলাকার পৌরাণিক কাহিনীর সহায়তা ছাড়া কোনো ব্যাপারেই সুরাহা করতে পারে না, আধুনিককালের সঙ্গে পূর্ণ পরিচিতি ঘটেনি বলে একালের মানুষও তেমনি সেকালের ভাবাদর্শকে এড়িয়ে চলতে পারছে না। মৃত-কালের ভাবাদর্শ তাকে ভূতের মতো চেপে ধরেছে, তার হাত থেকে সে আর মুক্তি পাচ্ছে না। তাই অভ্যন্তর-দ্বন্দ্ব তার ললাটলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রুচের উক্তি উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কেবলমাত্র সাহিত্য-পড়া আধুনিকদের বেলা তাঁর উক্তি বাস্তবিকই সত্য। ভাবাবেগের উপর নির্ভরশীল বলে তারা বিজ্ঞানে আস্থা স্থাপন করতে পারে না, উল্টো বিজ্ঞানের খুঁত ধরে বেড়ায়। তাই অন্যান্য সাহিত্যপ্রিয় লোকের মতো ক্রুচও বিজ্ঞানের ওয়াদা-খেলাপের অভিযোগ আনেন; কিন্তু বিজ্ঞানের ওয়াদাটা যে কী ছিল, সে-সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। শুধু এই বলে আফসোস করেন যে, ষাট বছর আগে ডারউইন ও হাক্সলি বিজ্ঞান থেকে যা আশা করেছিলেন, বিজ্ঞান তা দিতে পারেনি। কিন্তু এ-ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। ভাবমার্গী লেখক ও পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরাই নিজেদের বুজরুগি রক্ষার জন্য এ-ধরনের কথা বলে থাকেন। ক্রুচ্ সাহেবও তাঁর দলে ভিড়েছেন।

বর্তমানে জগতে-যে বহু অশুভদর্শী মানুষ রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তবে তার কারণ বিজ্ঞানের ব্যর্থতা নয়, অন্য কিছু। যুদ্ধের জন্য যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তারই ফলে এই দুঃখবাদের জন্ম। দুঃখবাদ চিন্তার ব্যাপার নয়, 'মুডের' ব্যাপার। আর মুড সৃষ্টি করে বাস্তব ঘটনা, দর্শন বা জগৎ সম্বন্ধে ধারণা নয়। সুতরাং একালের দুঃখবাদী মনোভাবের জন্য একালের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দায়ী না করে জগতের বাস্তব অবস্থাকে দায়ী করাই ভালো। ক্রুচ্ তো বলেছেন, কতকগুলি স্থির বিশ্বাস থেকে চ্যুত হয়েছে বলেই আধুনিককালে মানুষের এই দুরবস্থা। কিন্তু তাঁর মতে সায় দেওয়া যায় না। ইতিহাস তাঁর বিরুদ্ধে। ত্রয়োদশ শতকে তো স্থিরবিশ্বাসের কমতি ছিল না। অথচ সে যুগের মতো নৈরাশ্যব্যঞ্জক যুগ বিরল। রোজার বেকনের মতে, সে-যুগে কামুকতা ও লোভ কেবল সাধারণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, যাজকশ্রেণীও এই পাপস্রোতে ভেসে চলেছিলেন। তিনি বলেন, সে-যুগের ধার্মিকদের তুলনায় প্যাগান-যুগের সাধু-পুরুষরা অনেক উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। সংযম, সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। শুধু রোজার বেকন নন, তাঁর সমসাময়িক অপরাপর সাহিত্য-সেবকও তাঁদের কালকে ভালোবাসতে পারেননি বলে দুঃখ করে গেছেন। সুতরাং বেকন ত্রয়োদশ শতকের যে-ছবি এঁকেছেন, তাতে সহজেই আস্থা স্থাপন করা যায়।

ক্রুচের গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে রয়েছে প্রেমের আলোচনা। তাতে প্রেমের অভাবের জন্য করুণ সুরে হায়-আফসোস করা হয়েছে। ক্রুচের মতে ভিক্টোরীয় যুগে প্রেমের যে মূল্য ছিল, এ-যুগে তা নেই। এ যুগ প্রেমহীনতার যুগ। ভিক্টোরীয় যুগে স্কেপ্টিকগণ বা সন্দেহবাদীরা প্রেমকে আল্লাহ্র স্থানে বসিয়ে পূজা করত। একালে তেমনটি আর হচ্ছে না। মানুষের মনে পূজার ভাব রয়েছে! তার প্রকাশ না হলে অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় না। 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা'। সেকালের লোকেরা প্রেমের মারফতে পূজার ক্ষুধা মেটাত। প্রেমের সম্পর্কে এসে কঠিন-হৃদয় লোকও মরমীভাবাপন্ন হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। পরমাত্মা যেমন ত্যাগের প্রেরণা দেন, প্রেম থেকেও তেমনি ত্যাগের প্রেরণা পাওয়া যেত। প্রেমের জন্য সব খোয়াতে তারা প্রস্তুত ছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের যুগে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে ভিক্টোরীয় যুগ যেরূপ প্রেমময় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেকালের লোকদের কাছে সেরূপ প্রেমময় হয়ে দেখা দেয়নি। যুগের বিভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়াতে পারেন, এমন দু'টি বৃদ্ধমহিলাকে আমি জানতুম। তাঁদের একজন ছিলেন পিউরিটান আরেকজন ভল্‌টেরিয়ান। তাঁদের কথাবার্তার মারফতে আমি সে-যুগটিকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করব। প্রথম মহিলা বললেন : প্রেমের মতো এমন বাজে জিনিস নিয়ে এত কাব্য লেখা হবে কেন, আমি বুঝতে পারিনে। দ্বিতীয় মহিলাটি উত্তর দিলেন : আমি তো বাইবেলের সপ্তম আদেশ ভাঙায় তেমন কিছু পাপ দেখতে পাইনে। অন্তত ষষ্ঠ আদেশ ভাঙার চেয়ে তা-যে কম অন্যায় তাতো একরকম নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সপ্তম আদেশ ভাঙার বেলা প্রতিপক্ষের অনুমতির যে প্রয়োজন হয় তাতেই অপরাধটি হাল্‌কা হয়ে পড়ে। মহিলা দুটির কথার সুরেই বুঝতে পারা যায়, প্রেমের প্রতি তাঁরা কেউই শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন। একজনের কাছে প্রেম ঘৃণার ব্যাপার, আরেকজনের কাছে হালকা ফূর্তির। তবে ক্রুচ্‌ সাহেব ভিক্টোরীয় যুগের প্রেম সম্বন্ধে এমন উঁচু ধারণায় উপনীত হলেন কী করে? তাঁর ধারণার ভিত্তি কী? খুব সম্ভব, যুগের সঙ্গে মিল নেই এমন কোনো লেখকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। উদাহরণ-স্বরূপ রবার্ট ব্রাউনিঙের নাম করা যেতে পারে। তাঁর প্রেমদর্শন হচ্ছে :

> God be thanked, the meanest of His creatures
> Boasts two soul-sides, one to face the world with,
> One to show a woman when he loves her.

এর থেকেই বুঝতে পারা যায়, ব্রাউনিঙের মতে জগতের প্রতি একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মনোবৃত্তি হচ্ছে দ্বন্দ্বপরায়ণতার। যে মন নিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে মেশা যায়, সে-মন নিয়ে সাধারণের সঙ্গে মিশতে গেলে ভুল করা হবে।

সাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধ দ্বন্দ্বের, মিলনের নয়। এর কারণ কী? ব্রাউনিঙ বলবেন : জগৎ নিষ্ঠুর বলে। আমরা বলব : না, জগৎ আপনাকে আপনার নির্ধারিত মূল্যে গ্রহণ করতে চায় না বলে। আপনি চান আপনার অবিমিশ্র প্রশংসা। জগৎ তা দিতে নারাজ। সে আপনাকে বাজিয়ে নিতে চায়। তাই আপনি এমন একটি সঙ্গিনী বেছে নিতে চান যিনি কেবল আপনার প্রশংসাই করবেন, আপনার ক্রটির দিকে তাকাবেন না। এই সমালোচনাহীন প্রেম কিন্তু খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। অপক্ষপাত সমালোচনার শীতল বাতাস সইতে পারা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যার সে ক্ষমতা নেই সে দুর্বল, রুগ্‌ণ। তার কাছ থেকে জগৎ তেমন কিছু আশা করতে পারে না।

আমি নিজে প্রেমে বিশ্বাসী। অবশ্য আমার প্রেম ভিক্টোরীয় যুগের প্রেমের মতো অন্ধ নয়, মুক্তদৃষ্টি। এ কেবল সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ভালোর দিকেই তাকায় না, মন্দ দিকেও তাকায়। ভিক্টোরীয় যুগের লোকের মতো আমি প্রেমকে পূত পবিত্র মনে করে আকাশে তুলে রাখতে চাইনে। এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধার মূলে রয়েছে 'সেক্স-টেবু' বা যৌন-নিষেধ। যৌন ব্যাপারকে খারাপ ভাবা হত বলেই সেকালের লোকেরা তাঁদের সমর্থিত যৌন-সম্বন্ধকে 'পূত' 'পবিত্র' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে উচ্চাসন দিতে চাইত। নইলে সেকালে যৌনক্ষুধা যে একালের চেয়ে কম ছিল তা নয়। অধুনা মানুষ নূতন আদর্শ ভালোরূপে গ্রহণ করতে পারেনি

বলে পুরোনো আদর্শের প্রভাব থেকে পুরাপুরি মুক্তি পাচ্ছে না। তাই মনোজগতে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের ফলে নৈরাশ্য ও হতাশার জন্ম। আমার মনে হয়, এ-ধরনের লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও গলাবাজিতে তারাই বড়। তাদের প্রচারের ফলে এ-যুগের কালো দিকটাই লোকের কাছে বড় হয়ে উঠেছে, আলোর দিকটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তারা যত মন্দ বলে প্রচার করতে চায়, আসলে কিন্তু যুগটা তত মন্দ নয়। এই যুগের সঙ্গতিসম্পন্ন তরুণরা-যে প্রেমের ব্যাপারে অধিকতর সুখী, এ-কথা একরকম জোর দিয়েই বলা যায়। প্রাচীন আদর্শের অত্যাচার এবং যুক্তিধর্মী নীতির অভাবের দরুনই লোকেরা নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। অতীতের মোহ ভুলে গিয়ে হালের আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ না করলে এই নৈরাশ্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

কেন-যে প্রেমের মূল্য দেওয়া হয়, তা বলা সহজ নয়। তথাপি একবার চেষ্টা করে দেখছি। প্রথমত দেখতে পাওয়া যায়, প্রেম নিজেই একটা সুখের উৎস। সুখের তাগিদেই লোকেরা প্রেমের হাতে ধরা দেয়। এটাকে প্রেমের শ্রেষ্ঠ দিক হিসাবে ধরা না গেলেও প্রাথমিক ও অনিবার্য দিকরূপে সহজেই ধরে নেওয়া যায়। এটির অভাবে অপরাপর দিকগুলিরও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা।

তোমার চেয়ে মিষ্টি কিছুই নেই
এই ভুবনের মাঝে,
ওগো ও প্রেম, তাইতো তোমায় চাই
নিত্য সকাল সাঁঝে।
নিন্দা তোমার রটায় যারা, জানি,
পায়নি তোমার মধুর পরশখানি,
অন্ধকারে কাটায় তারা বেলা
হিংসা-দ্বেষের কাজে।
তোমার পরশ অন্তরেতে মোর
রাতের শেষে আনে সোনার ভোর
দিকে দিকে তাই যে কেবল শুনি—
আনন্দ-গান বাজে॥

কবি যখন এই পঙ্‌ক্তিগুলি লেখেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র জায়গায় প্রেমকে বসিয়ে নাস্তিক্যের সমাধান করতে চাননি, কিংবা বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটন করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে খুশি করতে, নিজেকে উপভোগ করতে, এইমাত্র। প্রেমের উপস্থিতি যেমন সুখের, অনুপস্থিতিও তেমনি দুঃখের। তাই প্রেমের জন্যে মানুষ এত উতলা হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, তা জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখগুলির স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গীত, পর্বতের ওপরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, পূর্ণিমা রাত্রে জোছনা-প্লাবিত সমুদ্র বক্ষ—প্রেমের সংস্পর্শ না হলে এসবের পুরো স্বাদ পাওয়া যায় না। প্রেয়সী নারীর সঙ্গ উপভোগ না করলে এসবের ইন্দ্রজাল অর্ধেকটাই অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়। তৃতীয়ত, 'আমি'র চেয়ে 'তুমি'কে বড় করে তুলে' প্রেম অহমিকার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পথটি বাৎলে দেয়। একাকিত্বপ্রিয় দার্শনিক-যে

সংসারে নেই, তা নয়। যথেষ্টই আছে। স্টোইক্ ও প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানরা তো মনে করতেন জীবনের কল্যাণসাধনের জন্য দরকার কেবল ইচ্ছাশক্তির—সেজন্যে অপরের সহায়তার কোনো দরকার হয় না। সকলের লক্ষ্যই যে কল্যাণ তা নয়। কেউ কেউ চায় শক্তিকে, কারো লক্ষ্য বা ব্যক্তিগত সুখ। কিন্তু সকলের মধ্যেই একটা সাধ দেখতে পাওয়া যায়, আর তা হচ্ছে, অপরের সাহায্য ছাড়া নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই কাজ ফতে করা যায়, এই বিশ্বাস। এই একাকিত্বপ্রিয় দর্শন-যে কেবল নীতির দিক দিয়ে মন্দ, তা নয়; জীবনের সহজ ও সার্থক বিকাশের পক্ষেও তা অন্তরায়। মানুষের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। জোর করে একা থাকতে হলে স্বভাবের বিরুদ্ধে যেতে হয়। মানুষের প্রকৃতিতে যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে, তা-ই তাকে বন্ধু ও সহযোগী খুঁজতে বাধ্য করে। প্রেমের স্বাদ যে পেয়েছে সে কখনও একাকিত্ব-দর্শনের সমর্থক হতে পারে না। সন্তান-বাৎসল্যের মতো এমন জোরালো অনুভূতি আর কি আছে? এরও গোড়ায় রয়েছে কিন্তু জনক-জননীর পরস্পরের প্রতি প্রেম। প্রেম একটা সাধারণ ব্যাপার—যত্রতত্রই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এই বলতে চাই যে, প্রেমের স্বাদ যে পায়নি, জীবন তার কাছে তার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করেনি। সে হতভাগা জীবনকে পেয়েও জীবন থেকে বঞ্চিত। প্রেম এমন একটা ব্যাপার, সন্দেহবাদের স্পর্শে যা মলিন হয়ে যায় না। তা চিরসুন্দর চিরপ্রাণপ্রদায়ী।

> প্রেম সে তো আগুনের শিখা, অন্তরেতে চির অনির্বাণ,
> অবসন্ন নয় কভু তাহা, নহে কভু রুগ্ণ, পরিম্লান।

এখন ক্রুচ্ সাহেব ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার আলোচনা করছি। তাঁর মতে ইবসেনের 'গোস্টের' চেয়ে শেক্সপিয়ারের 'কিং লিয়র' অনেক বড়। আমার মতও তাই। কিন্তু তাই বলে সেকালের মানুষের তুলনায় একালের মানুষকে হীন বলা যায় না। এ-যুগে যে কিং লিয়রের মতো বই লেখা যায় না তার কারণ এ-যুগের মানুষের অবনতি নয়, উন্নতি। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মানুষ ব্যক্তি-বিশেষের রাজসিক বিষাদের গুণকীর্তন করতে অনিচ্ছুক। সেকালে অনেকগুলি মানুষ বাঁচত একটি মানুষের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে। একালে তা আর হচ্ছে না। কিং লিয়র যে-মনোভঙ্গির সৃষ্টি, হালে সে মনোভঙ্গির কোনো মর্যাদা নেই বলেই ব্যক্তিতান্ত্রিক ট্র্যাজেডি সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ। শেক্সপিয়ার বলেছেন :

> রাজা যখন মরে আকাশেতে ধূমকেতু ভায়,
> ভিখারি যখন মরে কভু কিছু ঘটে না তথায়।

একটি চাল টিপলে যেমন সমস্ত ভাতের অবস্থা জানতে পারা যায়, তেমনি এই একটি উক্তির দ্বারাই সেকালের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। শেক্সপিয়ার যুগের ধারণার বশবর্তী না হয়ে পারেননি। তাই দেখতে পাওয়া যায় কবি 'সিনা'র মৃত্যু কমিক—হাস্যকর, আর 'সিজার' 'ব্রুটাস'-এর মৃত্যু ট্র্যাজিক—বিষাদান্ত। যুগের ভাবনার সঙ্গে পুরোপুরি বুক মেলাতে পেরেছিলেন বলেও শেক্সপিয়ার কিং লিয়রের মতো অনবদ্য নাটক রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একালের নাট্যকার যদি তাঁদের যুগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে পারেন তো তাঁরাও অনুরূপ সার্থক গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হবেন। একালে বড় হয়ে উঠেছে সমাজ, ব্যক্তি নয়। তাই এ-যুগে

ট্র্যাজেডি লিখতে হবে সমাজকে নিয়ে; ব্যক্তিকে নিয়ে লিখলে তেমন সার্থকতা পাওয়া যাবে না। তেমনি একটি গ্রন্থ হচ্ছে আরনেস্ট্ টলারের Massemensch (Massess & Man)। গ্রন্থটির মর্যাদা যে অতীতের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের সমান, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এই বলতে চাই যে, গাম্ভীর্য, মহত্ত্ব ও বীর্যে ওদের সঙ্গে এটির সাদৃশ্য রয়েছে। এরিস্‌টোটল-কথিত 'দুঃখ ও ভীতির তাড়নায় মানব-অন্তরের নির্মলতা সাধনের ক্ষমতা' এর আছে। এই ধরনের ট্র্যাজেডি খুব বিরল—'লাখে মিলে না এক'। ট্র্যাজেডি লিখতে হলে ট্র্যাজেডি অনুভব করতে হবে। আর ট্র্যাজেডি অনুভব করতে হলে যুগের মর্মে প্রবেশ করা দরকার। শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়; রক্ত দিয়ে, শিরা-উপশিরা দিয়ে, স্নায়ু দিয়ে যুগকে জানতে হবে।

ক্রুচ্ সাহেব যেরূপ সাহসের সঙ্গে নিরানন্দ জগৎকে স্বীকার করে নেন তাতে পাঠকরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হয়ে পারেন না। বীরের মতনই তিনি সমস্ত দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নিতে চান। কিন্তু জগৎকে নিরানন্দ মনে করার সত্যকার কোনো কারণ আছে কি? নতুন অবস্থার সংস্পর্শে এসে পুরাতন মূল্যবান আবেগগুলির জন্ম দিতে পারছেন না বলেই ক্রুচ্ ও ক্রুচের মতো অতীত প্রেমিক লেখকদের কাছে জগৎ নিরানন্দ। বর্তমানের সঙ্গে বুক মেলালে তাঁরাও বুঝতে পারতেন শেক্সপিয়ার যে মহৎ আবেগের অধিকারী তাঁরাও তা থেকে বঞ্চিত নন। শেক্সপিয়ারের পথটি অনুসরণ করছেন না বলেই তাঁদের এই দুর্দশা। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' যুগের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। মহৎ আবেগের উপাদান বর্তমানেও আছে। কিন্তু সমাজবোধ-বর্জিত বলে সাহিত্যিকগোষ্ঠী তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত। নইলে এ-যুগে বাঁচবার মতো কিছু নেই, এমন কথা তাঁরা বলতে পারতেন না। তাঁদের দুর্ভাগ্যের কারণ তাঁরা নিজেরাই। যৌবনের অতিভোগ ও বাস্তববর্জিত অত্যধিক মননের ফলেই এই দুঃখবাদ। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। আর বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপায় হচ্ছে কাজে নামা। কাজই আমাদের সুস্থ মানসিকতা দিতে পারে; আর কেউ না, আর কিছু না। যারা কাজ করে, তারাই আনন্দ পায়। জগতের স্বাদ-গন্ধ তাদের জন্য।

তাই, যাঁরা আর আনন্দ পাচ্ছেন না, জগতে বাঁচবার মতো কিছুই দেখছেন না, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ : লেখা ছেড়ে দিন, যদি সহজে ছাড়তে না পারেন তো জোর করে ছাড়ার চেষ্টা করুন। চিন্তার খোলস ত্যাগ করে জগতের পথে বেরিয়ে আসুন। নিজেকে এমন একটি অবস্থায় দাঁড় করান যেখানে প্রাথমিক শারীরিক প্রয়োজনগুলির দাবি মেটানোই হবে প্রথম ও প্রধান কাজ। তাহলেই দেখতে পাবেন আপনি পুনরায় জীবনে ফিরে এসেছেন, আর জীবনে ফিরে এসেছেন বলে সুখ পাচ্ছেন। মন নিয়ে অধিক নাড়াচাড়া করতে করতে আপনি মনকে বিগড়ে দিয়েছেন। এবার মনোবিহীন হয়ে বাস্তবের সুস্থ স্পর্শে আপনার সহজ ভোগ-কামনাকে জাগিয়ে তুলুন।

লেখার সত্যকার আকূতি আপনার ভেতর থাকলে আপনি অবশ্যই আবার লেখায় ফিরে আসবেন। আর এবার লেখা আপনার কাছে বাজে মনে হবে না বলে আপনি লিখে প্রচুর আনন্দও পাবেন।*

* কোনো ইংরেজ লেখকের অনুসরণে। —লেখক

সম্মান ও আত্মসম্মান

পৃথিবীতে উন্নতি করিবার পথ দুইটি—একটি আত্মশক্তি, আরেকটি চালিয়াতি। চালিয়াতিও একপ্রকার শক্তি বটে, তবে তাহা ধীরে ধীরে আত্মাকে ক্ষুদ্র ও নির্বীর্য করিয়া চারিত্রিক অধোগতি সাধন করে বলিয়া সর্বদা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

যাহারা আত্মশক্তির সাধনা করে, তাহাদের বড় হইতে সময় লাগে, অথবা তাহাদের কেহ কেহ কোনো সময়ে বড় হইতেই পারে না। তবু তাহাদের জীবন সার্থক এইজন্য যে, তাহারা একটি বড় রকমের আদর্শ দিয়া পৃথিবীকে ঋণী করিয়া যায়। সার্থক হইলে তো কথাই নাই, না হইলেও সাধনার একটা মূল্য আছেই। ভিতরের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাহা আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মানুষকে সৃজনধর্মী করিয়া তুলে, আর বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাহা মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি ও নীচতা হইতে রক্ষা করে।

সার্থকতা সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কারণ তাহা শুধু চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া বিধাতৃ-দত্ত শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সে-শক্তির তারতম্য আছে। তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি, দায়ী স্বয়ং বিধাতা। শক্তির অভাবের জন্য লজ্জাবোধ করিবার কিছুই নাই। সাধনার অভাবেই আমাদের লজ্জা। আমি চেষ্টা করিলেই রবীন্দ্রনাথ হইতে পারি না। কারণ রবীন্দ্রনাথের শক্তিতে আর আমার শক্তিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু সাধনায় তাঁহার সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে। না হইলে বিধাতার অপরাধ হইবে না, হইবে আমাদেরই।

একজন একশ টাকার মূলধন লইয়া কারবার শুরু করিল, আরেকজনের মূলধন মাত্র পঁচিশ টাকা। পঁচিশ টাকা মূলধনওয়ালার কাছে একশ টাকার মূলধনের লাভ প্রত্যাশা করা বাতুলতা; তবু সমীকরণ পদ্ধতির দ্বারা দেখা যাইতে পারে—উভয়ের মধ্যে লাভের সমতা আছে কি-না। না-থাকিলে বুঝিতে হইবে সাধনায় গলদ, উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। অতএব, ফলের দিকে না তাকাইয়া আমাদের সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়া যাওয়া উচিত। সফল হইলে তো ভালোই, না হইলে ঊর্ধ্বে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া অট্টহাস্য করিয়া বলিতে পারিব—আমার কী দোষ? আমার চেষ্টা তো আমি করিলাম। দোষ ঐ যাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, সেই ব্যক্তির। কিন্তু সাধনা না করিয়া বিনাচেষ্টায় কিছুতেই নিজেকে অকৃতকার্যতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিতে পারি না।

২

চালিয়াতির সহগামী তোষামোদ, তোষামোদ আত্মার পক্ষে ব্যভিচার। ভান ও অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তোষামোদ তলে তলে আত্মাকে কলুষিত করিয়া তোলে। শ্রদ্ধা না থাকিলেও

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার ভান করিতে করিতে চরিত্র কপট ও দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং পরিণামে ভালো-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতাই নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ, কারণ তখন বুঝিতেই পারা যায় না যে, নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা হইতেছে।

তোষামোদকারী ও বারবণিতা প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। যৌন সম্বন্ধ নিজে ভালো কি মন্দ, কিছুই নয়। তাহার সঙ্গে মানসিকতার যোগেই তাহা ভালো কি মন্দ হইয়া থাকে। প্রেম ব্যতীত প্রেমের ভান যেখানে সেখানেই তাহা পাপ, অন্যত্র নহে। শ্রদ্ধা ও প্রেম আত্মারই প্রকাশ—ইহা মানিয়া নিলে এ-কথা বলিতে পারা যায় যে, বারবণিতা ও তোষামোদকারী উভয়ে আত্মাবমাননাকারী বলিয়াই পাপী, অন্য কারণে নহে।

অথচ বারবণিতা ও বারবণিতা সম্পর্কিত ব্যক্তিকে দেখিলে আমরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করি, তোষামোদকারীকে দেখিলে ডাকিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠ আসন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না। ইহা হইতেই বুঝা যায়, আমাদের পাপ-পুণ্যের ধারণা কত অগভীর। যুক্তিযুক্ততার উপর নির্ভরশীল না হইয়া তাহা একটি সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া আছে। যাহা পাপ মনে করিতেছি, তাহা কেন পাপ হইল একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না। দশজনে যখন মনে করিতেছে তখন আমিও মনে করিতেছি; দশজনে মনে না করিলে আমিও বিরত থাকিতাম—ইহাই আমাদের মনোভাব। এই মনোভাব হইতে মুক্তিলাভ না করিলে আত্মিক মৃত্যু অনিবার্য। যে শিক্ষায় তাহা সম্ভব হইবে, তাহার গোড়ার কথা হইবে আত্মনিষ্ঠা বা আত্মসম্মান, তথাকথিত সম্মান নয়। আর লক্ষ্য হইবে জীবনের বিকাশ, সফলতা নয়। সফলতা লাভ করিলে তো ভালোই, না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। সফলতার জন্য বিকাশকে বর্জন করা আর আত্মহত্যা করা সমান।

৩

সম্মান আর আত্মসম্মানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। উভয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিমার পার্থক্য বিস্তর। আত্মসম্মানীর দৃষ্টি অন্তর্মুখী; আর সম্মানীর দৃষ্টি বহির্মুখী। আত্মসম্মানীর সম্মান সে নিজে ছাড়া অন্য কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সম্মানীর সম্মান অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল—সামান্য ধুলা লাগিলেও তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আজ তুমি লক্ষ টাকার মালিক বলিয়া যে সম্মানের অধিকারী, কাল লক্ষ টাকা ফুরাইয়া গেলে আর সে সম্মান থাকিবে না; তুমি নিতান্ত অসহায় ও কৃপার পাত্র হইয়া পড়িবে। তাই কখন কী হয় মনে করিয়া তোমাকে সতত ভীত ও ত্রস্ত থাকিতে হয়। আত্মসম্মান কিন্তু এই ভীতি ও ত্রস্ত হইতে মুক্ত—ভয়ার্ততার পাপ হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে।

সম্মানীকে লোক বুঝিয়া কথা বলিতে হয়, সময় বুঝিয়া বাহির হইতে হয়, স্থান বুঝিয়া পদার্পণ করিতে হয়, আর স্বার্থ বুঝিয়া ভাব করিতে হয়। নইলে তাহার সম্মান বজায় রাখা ভার হইয়া ওঠে। সে মুক্ত নয়, সে বন্দী—সতত সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান বলিয়া তাহার চিত্তের স্থৈর্য নাই।

আত্মসম্মানী কিন্তু এইসব বালাই হইতে মুক্ত। সে নিজের ভিতরে এমন এক শ্রেষ্ঠ সম্পদের সাক্ষাৎ পাইয়াছে, যাহার মৃত্যু নাই—যাহা অজর, অমর, অক্ষয়, যাহা আগুনে

পোড়ে না, জলে বিনষ্ট হয় না, দুর্যোগে ভাঙিয়া পড়ে না; শত শত বিপদপাতের মধ্য দিয়া গিয়াও যাহা ধ্বংস না হইয়া উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। এই পরম বস্তুটি লাভ করিয়াছে বলিয়াই সে সর্বত্র স্বচ্ছন্দগতি, সদানন্দচিত্ত—তাহাকে ভীরুর মতো আগপাছ ভাবিয়া গণিয়া গণিয়া পা ফেলিয়া চলিতে হয় না। সে ভাবনামুক্ত।

সম্মানীর ভয়ের কারণ এইখানে যে, সে জানে সে ফাঁকি দিয়া বড় হইয়াছে, এবং সেহেতু যে-কোনো সময়ে যে-কোনো অজুহাতে সেই বড়ত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। সেইজন্যই সে ভীরুর মতো সন্দেহপ্রবণ ও স্বল্পপ্রাণ বলিয়াই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। সে মনে করে সমস্ত জগৎ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুতরাং সকলকে টুঁটি টিপিয়া না মারিলে তাহার পক্ষে তিষ্ঠানো মুশকিল। তাহার অনেক কাজই সাহসের বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে তাহা সাহসের ভান, দুর্বলচিত্তের ছটফটানি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের অযোগ্যতা ঢাকিবার জন্য সে পারিপার্শ্বিক জগতকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে চায়। যতই সে সাবধান হয় ততই তাহাকে বিসদৃশ ঠেকে—ততই তাহার ভিতরের কদর্যতা বাহির হইয়া পড়ে। অযোগ্য ভুঁইফোড়ের আগমনে এইজন্য যুদ্ধ ও পারিবারিক কলহ অবশ্যম্ভাবী হইয়া ওঠে।

আত্মনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতা এইখানে যে, আত্মনিষ্ঠাই আমাদের বহু পাপ ও অন্যায় হইতে রক্ষা করিতে পারে—বাইরের নীতি অথবা তথাকথিত সংযমের আদর্শ নয়। প্রবৃত্তির প্রাবল্যের কাছে বাইরের নীতি তো তৃণবৎ তুচ্ছ, আর আত্মনিষ্ঠা ব্যতীত সংযম-সাধনার চেষ্টা বালুকার উপর অট্টালিকা নির্মাণের মতোই নিরর্থক। আত্মনিষ্ঠা মানুষকে সৌভাগ্যে প্রমত্ত দুর্ভাগ্যে অস্থির ও বিপদে অধীর হইতে দেয় না। কারণ আত্মাই শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে বড় কিছুই হইতে পারে না, এই উপলব্ধির মধ্যে একটা বড় রকমের আশ্রয় লাভ করিয়া সে গভীরত্ব লাভ করে। আত্মনিষ্ঠা নাই বলিয়াই তোষামোদকারী বিশ্রী ও প্রগল্‌ভ। তাহার মাথা ও হাত প্রতাপশালীর পায়ে। আর পা দুর্বলের ঘাড়ে। নিজের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকার দরুন সে অপরের আত্মাকেও অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করে না। থাকিলে লজ্জায় অধোবদন হইত।

৪

সাধকের প্রিয় হইতেছে আত্মসম্মান—নিজের আত্মার প্রতি নিজের অপরিসীম শ্রদ্ধা। আর তোষামোদকারীর প্রিয়—সম্মান। প্রথমটি ভিতর হইতে লাভ করিতে হয়, আর দ্বিতীয়টি বাহির হইতে। সাধক সৃজনধর্মী আর তোষামোদকারী সঞ্চয়ধর্মী (possessive)। তোষামোদকারী কী করিয়া সম্মান লাভ করে, তাহার একটা কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করা যাক।

সম্মান নির্ভর করিতেছে সার্থকতার উপর। সার্থক না হইলে যত বড় কাজেই হাত দাও না কেন, সম্মান নাই। কবিতা লিখিতেছ? ক্ষতি কী? রবীন্দ্রনাথ না হইলে আমরা কেয়ার করিব না।—ছবি আঁকিতেছ? বেশ তো। অবনীন্দ্রনাথ না হইলে আমরা ফিরিয়াও তাকাইব না। বিজ্ঞানচর্চা করিতেছ? ভালো কথা। জগদীশ বসু না হইয়া আসিলে তোমার স্থান নাই।—তাহার চাইতে যাহারা সাঁতারে প্রথম হইল, ফুটবল খেলায় কেল্লাফতে করিল, অথবা ঘোড়দৌড়ে ঘোড়া ছুটাইয়া সকলের আগে আসিল, তাহাদিগকেই আমরা বরমাল্য প্রদান করিব। কোন্ বিষয়ে কী

হইল, অথবা কীভাবে হইল, তাহা দেখিতে চাহিব না। দেখিব শুধু প্রথম হইল কিনা। তাহা হইলেই আমাদের বাস্। আমরা 'ফিলিস্টাইন'; আমাদের কাছে মুড়ি-মুড়কির একদর।

সার্থকতা লাভের সহজ উপায় তোষামোদ ও চালিয়াতি। উভয়ে মাসতুতো ভাই—সর্বদা একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলে। একটিকে ছাড়া অন্যটি অথর্ব হইয়া পড়ে। সুতরাং উভয়কেই একসঙ্গে গ্রহণ করিতে হয়। নইলে সার্থকতা সহজলভ্য হয় না। সাধনার দ্বারাও সার্থকতা লাভ করা যায়। কিন্তু সাধনার পথ দুরূহ বলিয়া তোষামোদ ও চালিয়াতিকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিতে হয়।

তুমি বড় হইয়াছ ও উচ্চপদবি লাভ করিয়াছ। তোমার দরবারে আসা-যাওয়া শুরু করিলাম। তোমার মনটি জয় করিতে তোমার শত্রু রহিমের বিরুদ্ধে অযথা নানা কথা বলিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে বোকার মতো তোমার প্রশংসা করিতে লাগিলাম, আর বোকার মতো তুমিও তাহা বিশ্বাস করিয়া খুশি হইতে লাগিলে। ফলে তোমার মনের কোণে আমার জন্য একটি স্থান রচিত হইল। আমি ধীরে ধীরে তোমার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম।

তারপর? তারপর লোকসমাজে আমার বেশ কদর বাড়িয়া গেল। যাহারা তোমার নিকট আসিতে সাহস করে না; তাহারা তোমার কাছে সুপারিশ করিবার জন্য আমাকে ধরিতে লাগিল। আমিও সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া তাহাদের তোষামোদ ও স্তুতিতে স্ফীত হইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে খোদার মর্জিতে ও লোকের কৃপায় পকেটও ভারী হইতে লাগিল। তারপর একটু চাল খাটাইয়া সামান্য তোষামোদকারীর পদ হইতে একেবারে তোমার মন্ত্রিত্বের পদে উন্নীত হইলাম। বাস্, আর আমাকে পায় কে? এখন তুমি আর আমি প্রায় সমান। তুমি আরো উপরের পদে উন্নীত হইলে আমিও তোমার পরিত্যক্তপদে উঠিয়া আসিলাম। এতদিন তোমাকে ও তোমার মতো অন্যান্য বড়লোককে নতজানু হইয়া সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে কোমর বাঁকিয়া গিয়াছিল, এখন অন্যের কোমর বাঁকাইতে লাগিলাম। নইলে তোমাদেরই যে প্রিয়-শিষ্য তাহা প্রমাণ করিব কী করিয়া!—তোষামোদলব্ধ উন্নতি ও সম্মানের এ-ই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কিন্তু তোষামোদের শুধু এই রূপ নয়, অন্য রূপও আছে। জনপ্রিয় হইবার জন্য প্রচলিত ও সামাজিক মতবাদের সমর্থন, কবি ও সাহিত্যিক হইবার জন্য বড় লেখকের অনুভূতি ও ভাব চুরি করিয়া রচনা লিখিবার চেষ্টা ইত্যাদি একপ্রকার তোষামোদ। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী ব্যতীত অন্য কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আধুনিকদের মধ্যেই এই পাপ অত্যন্ত বেশি। কারণ আধুনিকরাই একটা কিছু হইতে চায়, কিন্তু হইবার যথার্থ সাধনা করে না। তাহারা লেখে, কিন্তু কবিতার অনুভূতির প্রতি সত্যিকার কোনো দরদ রাখে না। মত প্রচার করে কিন্তু মতবাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয় না। মত তাহাদের গায়ের কোট, গায়ের চামড়া নয়। সুবিধানুযায়ী পরে আবার খুলিয়া রাখে। ভণ্ডামি ও চালিয়াতিতে ইহাদের জীবন ক্লিন্ন। বেশ বুদ্ধিলিপ্ত হইয়া জীবনযাপন করিলেও ভিতরে ভিতরে এদের আত্মা মরিয়া আসে, অন্তরের সত্যোপলব্ধি নষ্ট হইয়া যায়। কবি ও সাহিত্যিকের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা জ্ঞান হইতে বঞ্চিত বলিয়া ইহারা অত্যন্ত সুবিধাবাদী হইয়া পড়ে। বড়লোকের কেদারায় বসিতে পারিলে তাহারা নিজেকে সরফরাজ মনে করে, এক রাত্রি ইষ্টক নির্মিত গৃহে ঘুমাইতে

পারিলে নিজের জীবন ধন্য মনে না করিয়া পারে না। ইহারা অশ্লীল ও কদর্য। দেখা তো দূরের কথা, ইহাদের নাম শুনিলেও চিত্তের শান্তি নষ্ট হইয়া যায়।

৫

আসলে বিচারপূর্ণভাবে দেখিতে গেলে, তোষামোদ ও চালিয়াতির দ্বারা উন্নতি লাভ করা যায় না। তাহাতে উন্নীত হওয়া যায়, কিন্তু উন্নত হওয়া যায় না। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে চারিত্রিক ও মানসিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, চালিয়াত ও তোষামোদকারীদের জীবনে তাহা অনুপস্থিত। সে যে-কে-সে অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। শুধু বাহিরের পোশাকি পরিবর্তন ঘটে মাত্র। সে পদকে মর্যাদা দান করে না, পদ তাহাকে মর্যাদা দান করে। তাহার পদে তাহাকে কেমন যেন মানায় না—গম্ভীর হইলে মনে হয় অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। যেন ধরা পড়িবার ভয়ে সতত অতিরিক্ত সাবধান।

উন্নতির একমাত্র পন্থা সাধনা। সাধনা ব্যতীত জীবনে লাবণ্য ফোটে না। উন্নীত না হইলেও তাহাতে লাভ। যতটুকু সাধনা করিলাম ততটুকু অগ্রসর হইলাম, ততটুকু চরিত্রের বিকাশ সাধন হইল। বাস্ তাহাতেই তৃপ্তি; তাহাতেই আনন্দ। ভিতরে ভিতরে আমি বাড়িলাম, integrated হইলাম, ইহার চাইতে বড় কথা আর কী হইতে পারে? কিন্তু গভীর না হইলে তাহা উপলব্ধি করা যায় না, সূক্ষ্মদর্শী না হইলে তাহা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। কারণ তাহা বাহিরের বস্তু নয়, তাহা চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে।

সাধককে ভবিষ্যতের ভাবনা ভুলিয়া, লাভ-লোকসানের মায়া কাটাইয়া কেবল সৃষ্টির আনন্দে কাজ করিতে হয়। সাধনাকে বড় না করিয়া সিদ্ধিকে বড় করিয়া দেখিলে সাধকের চলার শক্তি মন্দীভূত হইয়া আসে, তাহার ভিতরের তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছিতে গিয়া সে মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করিয়া বসে। লক্ষ্যে সে পৌঁছে আর উন্নতিও সে লাভ করে বটে, তবে তাহাই তাহার চিন্তাভাবনার একমাত্র কারণ হইয়া ওঠে না, হইলে সাধনার গতি স্তব্ধ হইয়া যায়—চিত্ত অস্থির হইয়া পড়ে। মনে হয়, সাধক মাত্রই ক্ষণবাদী। ক্ষণগুলির যথার্থ ব্যবহারই তাহাদের একমাত্র কাজ। তবে লক্ষ্যের প্রতি একটুখানি দৃষ্টি না রাখিলে সাধনার ধারা এলোমেলো হইতে পারে বলিয়া তাহার প্রতি মাঝে মাঝে একটু দৃষ্টি রাখা সাধকের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

সঞ্চয়শীলতা সাধকের ধর্ম নহে। সঞ্চয়ের জালে বন্দী হইলে সাধনায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। শুধু বাহিরের বস্তুই নয়, তাহার সৃষ্টির চাইতে সে নিজেই বড় বলিয়া তাহাকে নিজের সৃষ্ট-বস্তুর মায়া কাটাইয়াও চলিতে হয়।

সাধকের মর্মবাণী :

হায়রে হৃদয়—তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু
পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

প্রাপ্তের চাইতে অপ্রাপ্তই তাহাকে বেশি করিয়া টানে। তাহার সাধনা আত্মা–বধূর নব নব রূপ দেখিবার সাধনা। সঞ্চয়ের প্রতি লোভ থাকিলে উদার ও সুন্দর জীবনযাপন করা মুশকিল হইয়া ওঠে—চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বিক্ষিপ্ততা অরাজকতার মূর্তি নিয়া দেখা দেয়। রাসেলের উক্তিই এ–সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

> "..... not even the most purity defensive forms of possessiveness are in themselves admirable; indeed as soon as they are strong, they become hostile to the creative impulses."Take no thought, saying what shall we eat ? or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed ?"" Whoever has known a strong creative impulse has known the value of this precept in its exact and literal sense. It is preoccupation with possession more than anything else, that prevents men from living freely and nobly ?"

সাধক সাধনার দ্বারা যাহা দান করিয়া যায়, তন্মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্বই প্রধান। ইহা খণ্ড–সৃষ্টি নয়, সম্পূর্ণ সত্তা। সমস্ত খণ্ড–সৃষ্টি ইহার মধ্যে বিধৃত। এই ব্যক্তিত্ব সে শুধু তাহার পুত্র–কন্যাকে দান করিয়া যায় না, সমস্ত মানব–সম্প্রদায়ই তাহার উত্তরাধিকারী; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার পুত্র–কন্যাই তাহা হইতে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়। অত্যন্ত নিকট হইতে দেখে বলিয়া অনেক সময় তাহারা তাহার সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না।

সাধকের চিন্তা ও কর্ম যেখানে সকলের, সেখানে সে নৈর্ব্যক্তিক। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে সাধক যতই নৈর্ব্যক্তিক হইতে থাকে, ততই তাহার ক্ষুদ্র 'আমি' ক্ষুদ্রতম হইয়া, বৃহৎ 'আমি' বৃহত্তর হইতে থাকে। নৈর্ব্যক্তিক হইবার সহায়ক বলিয়াই আল্লাহর আরাধনা মানবচিত্তের পক্ষে এত কল্যাণকর। তিনি অনন্ত, অসীম ও প্রেমময়। সকলকে লইয়াই তিনি জাগিতেছেন কিন্তু সকলকে অতিক্রম করিয়াও আছেন, তিনি অবিনশ্বর আর সকলে নশ্বর। এই মনোভাব মানুষকে যতটা ঔদার্য ও বিশালতা দান করিতে পারে, আর কোনো মনোভাব ততটা পারে না। এইখানেই ঈশ্বরের ধারণার শ্রেষ্ঠতা। ডিমোক্রেসি বলো, এনার্কিজম বলো, কোনোকিছুতেই তুমি এতবড় সার্থকতা লাভ করিতে পারো না, এমন বিপুলভাবে পরিপূর্ণ হইতে পারো না। কিন্তু যেখানে এই চারিত্রিক প্রভাব নাই, সেখানে তাঁহার আরাধনা শুধুই নাম–পূজা, শুধু অভিনয়। তোমার গুণ গাহিলাম, কিন্তু গুণে গুণান্বিত হইলাম না; তোমার নাম করিলাম, কিন্তু চরিত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলাম না—ইহার মতো বড় রকমের ঠাট্টা আর কী হইতে পারে, ধারণা করা কঠিন। আল্লাহ্‌ যদি সবাক হইতেন তবে নিশ্চয়ই চিৎকার করিয়া বলিতেন —বন্ধ করো তোমার পূজা, শুনিতে চাই না ঐ অনুপযুক্ত মুখে আমার নাম–গান।—কিন্তু তিনি নীরব বলিয়াই তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে।

অনেকে ব্যক্তিত্বকে প্রভুত্বের সঙ্গে এক করিয়া দেখে—প্রতাপশালীকে ব্যক্তিত্বশালী বলিয়া ভুল করে। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সে অত্যন্ত সাধারণ, তাহার কোনো বিকাশ নাই, সুতরাং ব্যক্তিত্বও নাই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোথাও তাহার তিলমাত্র প্রভেদ নাই। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আসলে সেবার সম্পর্কই বেশি। সেবার ভাব না আসিলে নৈর্ব্যক্তিক

হওয়া যায় না, আর নৈর্ব্যক্তিক না হইলে ব্যক্তিত্ব বিশাল ও গভীর হয় না। সেবার ভাব না জাগিলে শুধু 'আমি'র কারাগারে বন্দী থাকিতে হয় বলিয়া জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তোষামোদকারীর নৈর্ব্যক্তিক সাধনা নাই বলিয়া তাহার ব্যক্তিত্বও নাই। তাহার প্রতাপ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রভাব নাই। যেটুকু থাকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহা শেষ হইয়া যায়। সাধকের ব্যক্তিত্ব কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরেও বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া তাহাকে পৃথিবীতে অমর করিয়া রাখে। নৈসর্গিক দ্রব্যের মতো ব্যবহারে লাগাইয়া মানুষ তাহা হইতে প্রচুর উপকার লাভ করিতে পারে। তবে এ-কথা সত্য যে, মৃত্যুর পরে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই সাধক সাধনা করে না, কীর্তিমান হইবার জন্যই কীর্তি গড়া তাহার উদ্দেশ্য নয়। এই সাধনাতেই তাহার আনন্দ ও তৃপ্তি বলিয়া সে তাহা করিয়া যায়। 'ফাল্গুনী'র যুবকের ভাষায় সাধকের মর্মবাণী : "কীর্তি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে? কীর্তি তো আমাদের ফেনা—ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না।"

৬

সাধকের প্রথম ও প্রধান শত্রু লোভ—চাকচিক্যময় জীবনের প্রতি টান। দ্বিতীয় শত্রু প্রতিযোগিতা। উভয়ের সম্মিলিত অত্যাচারে তাহার জীবন দুর্বিষহ হইয়া ওঠে। লোভ ও প্রতিযোগিতা প্রথমে তাহার ভিতর হইতে জাগে না, অন্যে জাগাইয়া দেয়। তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া তাহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ যে তাহার অপকারই করে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। পারে না বলিয়াই ক্ষমার পাত্র। নইলে তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনের অভিযোগ আনা সহজ হইত। সাধককে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন করিলে তাহার ভিতরের আনন্দের উৎসটি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তখন সে অথর্ব ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। ইচ্ছাবৃত্তির দ্বারা সৃজনাবেগকে ধ্বংস করিতে করিতে সে ক্রমাগত তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া ওঠে, তাহার জীবনের পূর্ণতা ও চরিত্রের অটুটভাব নষ্ট হইয়া যায়। রাসেল এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য :

> The worst things are those to which will assents. Often, chiefly from the failure of self-knowledge, a man's will is on lower level than his impulse; his impulse is towards some kind of creation, while his will is towards a conventional career, with a sufficient income and the respect of his contemporaries. ...Because the impulse is deep and dumb, because what is called commonsense is often against it, because a young man can only follow it if he is willing to set-up his own obscure feeling against the wisdom and prudent maxims of elders and friends. It happens in ninety-nine cases of a hundred that a creative impulse, out of which a free and vigorous life might have sprung, is checked and thwarted at the very outset : the young man consents to become a tool, not on independent workman, a mere means to the fulfilment of others, not the

artificer of what his own nature feels to be good. In the moment when he makes this act of consent something dies within him. He can never again become a whole man, never again have the undamaged self-respect, the upright pride, which might have kept him happy in his soul inspite of all outward troubles and difficulties......

বলা হইয়াছে, অন্তরের সহজ প্রবৃত্তি নষ্ট হওয়ার দরুন সাধক ক্রমে তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া ওঠে। তিক্ততা ধীরে ধীরে নৃশংসতায় পরিণত হয়, আর সেই নৃশংসতাকে সে কখনো সাহস, কখনো নৈতিকতার ছদ্মবেশ পরাইয়া চালাইতে থাকে। ক্রমে প্রতিযোগিতার ইচ্ছা বলবতী হয়, অর্থাৎ নিজের সুখ-সৃষ্টির চাইতে পরের দুঃখ-সৃষ্টির স্পৃহা প্রবল হইয়া দেখা দেয়। নিজের ভিতরের কাজ করিবার প্রেরণা স্তব্ধ হইয়া আসে, অন্যকে জব্দ করিবার জন্যই তাহাকে সবকিছু করিতে হয়। জীবনের বিকাশের আর আনন্দ পায় না বলিয়া যে-কোনো ক্ষেত্রে যে-কোনো উপায়ে সার্থকতা লাভকেই সে বড় করিয়া দেখিতে শুরু করে। সার্থকতা লাভের জন্য সে এত ব্যস্ত হইয়া ওঠে যে, আত্মার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া নিতান্ত সাধারণ হইয়া পড়িতেও তাহার কুণ্ঠাবোধ হয় না। এইরূপে success-এর bitch goddess-এর আরাধনা চিত্তের সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া তাহাকে একেবারে অনুভূতিহীন পশুতে পরিণত করে।

সাধকের জীবন কীভাবে লোভ ও প্রতিযোগিতার বশবর্তী হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহার একটা কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করা যাক। ধরা যাক, 'ক' নামক একটি লোক সহজ প্রেরণার বশবর্তী হইয়া শিল্পচর্চাকেই তাহার সাধনার বিষয় করিয়া তুলিল। (এখানে বলা দরকার, প্রত্যেক সাধককেই সহজ প্রেরণার বশবর্তী হইয়া চলিতে হয়। নইলে তাহার পথচলা সহজ ও আনন্দদায়ক হয় না।) শিল্পে কী করিয়া নতুনত্ব সৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই তাহার ঝোঁক। একলা ঘরে বসিয়া অথচ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহার দিন কাটে বেশ। জীবিকা অর্জনের চাইতে জীবনার্জনের দিকেই তাহার নজর বেশি। সে অনুভব করে তাহার চিত্তে স্পর্শমণির মতো এমন এক দুর্লভ বস্তু আছে যাহার স্পর্শে সামান্য ধূলিবালিও সোনা হইয়া ওঠে, নিতান্ত সাধারণ জিনিসও অসাধারণত্ব লাভ করে। সেই স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিবার জন্য কীট-পতঙ্গ, তৃণলতা সমস্ত কিছু লইয়া বিশ্ব-সংসার তাহার মনের দুয়ারে অতিথি। আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার বলিয়া সে তাহার আত্মার প্রতি সতত শ্রদ্ধাশীল। কস্তুরী-মৃগের মতো সে আপনার গন্ধে আপনি পাগল। কিন্তু তাহার এই তন্ময়তার অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তাহার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তাহার শিল্পচর্চায় খুশি না থাকিয়া তাহাকে বাস্তবজগতে উন্নতি করিবার জন্য উপদেশ দিতে থাকে। তাহার মা তাহার বাল্যবন্ধু 'খ'-র নজির দেখাইয়া তাহাকে বড়লোক হইতে বলে। 'খ' নাকি পাটের ব্যবসায় করিয়া অজস্র টাকা করিয়াছে; আর এক প্রাসাদতুল্য বাড়ি নির্মাণ করিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাদের কথায় তাহার মন বিরক্ত হইয়া ওঠে, মনে হয়, তাহাকে আত্মহত্যা করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু ক্রমে সন্দেহ শয়তান তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া তাহার ভিতরের দেবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। সন্দেহ ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিতে থাকে—ফেলে রাখো তোমার শিল্পচর্চা। ওসব দিয়ে কী হয়? পারো তো 'খ'-র মতো একখানা অট্টালিকা নির্মাণ করো, আর লোকের

আভূমি-প্রণত সেলাম গ্রহণ করো। দেবতা তিরস্কারের সুরে বলে : ছি ছি এ কী তোমার মতিগতি? শেষে কাঞ্চন ফেলে কাচ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে? আত্মার বিকাশেই তোমার তৃপ্তি; কেন ওসব বাইরের আবর্জনার প্রতি নজর দাও? পরিণামে বহু যুঝাযুঝির পর দেবতা পরাজয় লাভ করে। সন্দেহ জয়ী হইয়া তাহাকে বাস্তব-জগতে উন্নতি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। ক্রমে প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগে এবং তাহার আনুষঙ্গিক পাপও অন্তর-রাজ্য দখল করিয়া বসে। সে আত্মহত্যা করে। শিল্পচর্চা ছাড়িয়া দিয়া সে ছবির ব্যবসায় শুরু করে এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তাহাতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া 'খ'কে জব্দ করিবার জন্য এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করে। চারিদিকে তাহার জয়জয়কার পড়িয়া যায়। তাহার উন্নতি ও সম্মান দেখিয়া তাহার মা তাহাকে স্নেহ-আশীর্বাদ জানায়, পিতা যোগ্য-পুত্র বলিয়া অভিনন্দন করে, আর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধব, এতদিনে সে মিথ্যা কল্পনা পরিহার করিয়া নিরেট খাঁটি মানুষ হইয়াছে বলিয়া করমর্দন করে।

কিন্তু পূর্বেকার প্রশান্তি আর তাহার নাই। একলা ঘরে বসিয়া থাকিতে এখন আর তাহার ভালো লাগে না। মনে হয়, কী যেন হারাইয়া গিয়াছে; কিসের বিরহে যেন মন উতলা হইয়া উঠে, চোখ বাষ্পায়মান হইয়া আসে। ব্যথা ভুলিতে সে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হুল্লোড় করিয়া বেড়ায়— পাগলের মতো ছুটাছুটি করিয়া সময় কাটায়। তবু আনন্দ করায়ত্ত হয় না। 'খ,' 'খ,' 'খ';— 'খ'-র ভূতে তাহাকে পাইয়াছে, 'খ' ছাড়া দুনিয়াতে সে এখন আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। তাহার নিজের অস্তিত্বের চাইতেও 'খ'-র অস্তিত্ব তাহার কাছে এখন সত্যতর। আনন্দ তাহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী ঢুঁড়িয়াও সে একবিন্দু আনন্দ লাভ করিতে পারে না। যাহা তাহার জন্য আকাশ আলোর মতো অজস্র ছিল, যাহা নিজে উপভোগ করিয়া অন্যকে বিলাইয়াও উদ্‌বৃত্ত থাকিত, তাহা এমন দুর্লভ হইল কী করিয়া, শত চিন্তা করিয়াও সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শুধু মনে হয়, কী যেন পৃথিবী হইতে পলাইয়া গিয়াছে, কী যেন নাই। যে সন্ধ্যাতারা প্রতি সন্ধ্যায় তাহার জন্য আনন্দবার্তা বহন করিয়া আনিত, তাহা যেন এখন বিদ্রূপবার্তা নিয়া আসে। তাহার মুখে হাসি নাই, আছে ব্যঙ্গ।

সে জানে না যে সে আত্মহত্যা করিয়াছে—তাহার পিতামাতাও না, বন্ধু-বান্ধবও জানে না। যেসব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আত্মা-আত্মা করিয়া অস্থির, তাহারাও না। আত্মসম্মানের প্রতি আমাদের নজর নাই, বাহিরের সম্মান পাইলেই ব্যস্। সম্মানের জন্য আত্মাকে বিক্রি করিতেও আমরা প্রস্তুত। তবু আমরা ধার্মিক। ধর্ম ব্যাপারে পান হইতে চুন খসিলে অস্থির হইয়া পড়ি। হায় রে, ধর্মের খাঁচাটি লইয়া আমরা সানন্দে নৃত্য করিতেছি, পাখিটি কবে উড়িয়া গিয়াছে, সেদিকে কাহারো লক্ষ্যই নাই।

If the wicked flourish and the fittest survive, Nature must be the God of rascals. — G.B.S.

যেদিন 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট'—এই সাধারণ সত্যটি দার্শনিকের কণ্ঠে প্রথম ঘোষিত হল, সেদিন থেকেই পৃথিবীর সর্বনাশের সূত্রপাত। কেননা, মূল্যবোধ বিস্মৃত হয়ে সেদিন থেকেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ গুণরাজিকে অবহেলা করে নিকৃষ্ট শক্তিসমূহের পূজার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে, আর শুধু বাঁচার কথাটা বড় হয়ে উঠল বলে সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ মানুষের দৃষ্টিসীমা থেকে অনেক দূরে সরে গেল। সে বুঝতে পারলে, এসব গৌণ ব্যাপার, বাঁচার জন্য এসবের কোনো প্রয়োজন নেই, যদি পাওয়া যায় ভালো। অধিকন্তু ন দোষায়—না পাওয়া গেলেও তেমন দুঃখ নেই।

দার্শনিকের চেষ্টা হয় অনেক সময় 'মাচ এডো এবাউট নাথিং' অথবা পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো। অনেক মাল-মশলা সংগ্রহ ও গবেষণার ফলে তাঁরা যে-সত্যে এসে পৌছোন, অনেক সময় তা মামুলি সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দর্শনের সমর্থনে তাই হয়ে ওঠে সকলের শ্রদ্ধেয়—সাধারণ ব্যাপারটাও অসাধারণ হয়ে দেখা দেয়। 'ফিট' লোকেরাই সবসময় বেঁচেছে ও বাঁচবে এ-কথাটা বলার জন্য দার্শনিকের গবেষণার প্রয়োজন হয় না, সামান্য পর্যবেক্ষণশীলেরাও তা বলতে পারে। সুতরাং এ সিদ্ধান্তের জন্য দার্শনিকের কোনো কৃতিত্ব নেই; তাঁর কৃতিত্ব সত্যে পৌছার জন্য তাঁর যে আয়োজন—তাতে; উপাদান-সংগ্রহ ও বিচিত্র তথ্য আবিষ্কারে মানুষ হঠাৎ-সৃষ্ট জীব নয়, জীবপরম্পরার ধারাবাহিক পরিণতি, এই সত্যের উদ্‌ঘাটনে।

অথচ মানুষ সেইটেই বড় বলে গ্রহণ করলে—নাচুনে বুড়ি ঢোলের তালি পেলে যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়, মানুষও তেমনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের ভিতরের যুদ্ধংদেহী ভাবটিকে আঁকড়ে ধরলে—তেল সিঁদুর দিয়ে দেবতার মতো তার পূজা শুরু করলে। নিজেরা যা স্বভাবতই ভালোবাসে, দার্শনিকের সমর্থনে তাই তাদের কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠল; আর দার্শনিকরা যা ধরতে-ছুঁতে পান না, মানবজীবনের সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধ্যান-কল্পনা, প্রেম-সৌন্দর্যের কদর কমতে লাগল। এসব কী? বিজ্ঞান তো এসব ঠাহর করতে পারে না। সুতরাং এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান না হয়ে উপায় কী? সত্য তাই; বিজ্ঞানের সহায়তায় যাচাই করতে গেলে মূল্যের তো কথাই নেই, এসবের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। কেননা, মানুষ যেখানে প্রকৃতির সৃষ্টি সেখানেই বিজ্ঞানের অধিকার, যেখানে সে নিজের রচনা সেখানে বিজ্ঞান বেকার। প্রেম, সৌন্দর্য ইত্যাদি মানুষের নিজের সৃষ্টি বলে বিজ্ঞান এদের সম্বন্ধে নির্বাক অথবা সন্দিহান। কিন্তু এদের সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা, তথা সভ্যতার সাধনা।' যোগ্যতমের

উদ্বর্তন নীতি এই সাধনার পরিপন্থী, কেননা তা শুধু বাঁচবার জন্য প্রয়োজনীয় নখদন্ত ও নখদন্তের স্থানীয় বন্দুক-বোমা-সঙ্গিনকেই বড় করে তোলে—উদার বুদ্ধিকে বর্জন করে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতে শেখায়। ফলে মানুষের অধোগতি ঘটে।

মানুষ শুধু উদ্বর্তনে তৃপ্ত থাকতে পারে না, বিকাশই তার জন্য প্রয়োজনীয় আর তাতেই মনুষ্যত্বের জয়। উদ্বর্তনের জন্য অত্যধিক উদ্বেগ বিকাশের প্রতিকূল। কেননা, তা শুধু সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি-আশ্রিত সন্দেহ ও ঘৃণা-বিদ্বেষকে বড় করে তোলে, আর সন্দেহ-বিদ্বেষ বিকাশের সহায় নয়, অন্তরায়। সেজন্য প্রয়োজনীয় উদার বুদ্ধি-লালিত আনন্দ আর প্রেম—আলোক আর মাধুর্য। কথায় বলে সাবধানের মার নেই, কিন্তু আসলে অতি-সাবধানেরই আত্মিক মৃত্যু ঘটে। ভয়ার্ততার ফলে তার আত্মা সঙ্কুচিত ও মলিন হয়ে যায়। আত্মরক্ষার তাগিদে-যে জীবনের অধোগতি ঘটে, অন্তত উন্নয়ন হয় না, উদ্ভিদজগতের দিকে তাকালে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। পশুদের সঙ্গে সংগ্রামে টিকে থাকার উদ্দেশ্যেই কোনো কোনো বৃক্ষ তিক্ত বা উগ্রগন্ধযুক্ত দেহ নিয়ে অঙ্কুরিত হয়। বেল ও লেবু পাতার উগ্রগন্ধ ও তাদের দেহে কাঁটার উৎপত্তি পশুদের সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে থাকার তাগিদেই। এমন যে গোলাপ, এককালে সেও বন্যপুষ্প ছিল, গায়ের কাঁটা দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। মানুষের হাতে পড়ে এখন সে সভ্য-ভব্য হয়েছে। এখন সে দুর্বল, অসহায়—বেড়ার ভিতর ছাড়া বাড়তে পারে না। সভ্য-ভব্য মানুষও একপ্রকার দুর্বল মানুষ—রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান ছাড়া বাঁচতে পারে না ! গোলাপের জন্য যেমন বেড়া, মানুষের জন্য তেমনি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রছাড়া মানুষ সভ্য-ভব্য হয়ে বাঁচতে পারে না। রাষ্ট্র যেমন মানুষকে রক্ষা করে, রাষ্ট্রকে রক্ষা করাও তেমনি মানুষের কর্তব্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যেদিন রাষ্ট্র বলে : আমিই সব, আমাকে রক্ষা করো, তোমাদের নিজের দিকে তাকাবার দরকার নেই, আমার পূজা করাই তোমাদের জীবনের সার্থকতা; সেদিন সত্যই মানুষের দুর্দিন, সেদিন মানুষের সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়।

গোলাপের কাছে যদি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতি বারবার আওড়ানো যায়, আর বলা হয় যে, গরু-ছাগলরা তাকে গ্রাস করবার জন্য চারদিকে ওত পেতে আছে, তো পাপড়িগুলি কাঁটায় পরিণত হয়ে গোলাপের গোলাপত্ব নষ্ট হতে বিলম্ব হবে না। অচিরেই তার সৌন্দর্য যাবে ধসে, আর তার কদর্যতা ও কাঠিন্য মাথা উঁচিয়ে আত্মঘোষণা করবে।

মনুষ্যত্ব সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। সঙ্কীর্ণতা মনুষ্যত্ব-গোলাপের পাপড়িগুলিকে কাঁটায় পরিণত করে। সঙ্কীর্ণতার গোড়ায় ভয়—খেয়ে ফেলবে এই শঙ্কা 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট' নীতি এই ভীতির পরিপোষক। তা শত্রুর কথা মনে করিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় না; আর শত্রুকে না-ভুলতে পারলে সুন্দর হওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে কালো রঙে চিত্রিত করে দেখলে তাদের লাভ হবে না, ক্ষতি হবে—সে কালোর প্রভাব কালিমা লেপনকারীর চরিত্রেও লাগবে। অপরকে ভালো ভেবেই আমরা ভালো হতে পারি, খারাপ ভেবে নয়। বাঘ বা সাপের সঙ্গে বাস করছি এই সচেতনতা মনুষ্যত্বের পরিবর্তে পশুত্বকেই বাঁচিয়ে রাখে। কূটবুদ্ধি ও হ্রস্বদৃষ্টি রাজনীতিক তা বুঝতে পারেন না বলে ভিন্ন সমাজের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্তকে বড় করে তুলে নিজের সমাজের ক্ষতিই করেন, কল্যাণ নয়। মানুষকে ভালো ভাবতে হবে নিজের ভালোর জন্যই; নিজের ভিতরের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলিকে সক্রিয় রাখবার এই একমাত্র উপায়। ভয় ও

সন্দেহ জীবনের পক্ষে মারাত্মক, এই বিশ্বাস না থাকলে জীবন অসুন্দর হয়ে পড়ে, খোশমেজাজ ও বহাল তবিয়ত নষ্ট হয়; আর তা নষ্ট হলে মানুষের ভালো কাজেরও মূল্য দেওয়া যায় না। উত্তেজনার বশে কৃত মহৎ কাজেরও মূল্য কম। তাই 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতি জোরেশোরে প্রচার না-করাই ভালো। যদি একান্তই বলতে হয়, তবে তা যেন দুর্বলের কানে কানে বলা হয়, সবলের কানে কানে নয়। সবলকে তা করে তুলবে অত্যাচারী ও স্বাধিকার প্রমত্ত—অত্যাচারের দার্শনিক সমর্থন পেয়ে সে শক্তির অপব্যবহার করবে।

মানুষের জন্য বড় নীতি প্রেমের নীতি, হিংসা বা বিদ্বেষের নীতি নয়। যোগ্যতমের উদ্বর্তন মতবাদ এই প্রেমের নীতিতে অবিশ্বাসী করে মানুষকে সর্বনাশের পথে চালায়। প্রয়োজনীয় মন্দ-ব্যাপার (Necessary evil) যখন জীবনের সারবস্তু (Summum bonum of life) হয়ে ওঠে, তখন জীবনের আর কিছুই থাকে না—প্রকৃত ঐশ্বর্যের ব্যাপারে তা একেবারেই ফতুর হয়ে পড়ে। বাঁচার সাধনা আর ঐশ্বর্যের সাধনা এক নয়, ঐশ্বর্যের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন। ছোট জিনিসের দাবিকে না দমালে বড় জিনিসের দাবি বড় হয়ে উঠতে পারে না। বাঁচার সাধনার আধিক্যের ফলে মানুষের ভেতরের ছোট মানুষটিই প্রাধান্য লাভ করে, বড়মানুষটি নষ্ট হয়ে যায়। সেবার অভাবে দেবতা অন্তর্হিত হন, মন্দির খালি পড়ে থাকে।

'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ অর্থ-প্রতিপত্তির লোভে। চরিত্রকে কলুষিত করতে এর মতো আর দ্বিতীয় কিছুই নেই। এই লোভের হাতে যারা ধরা দেয়, তাদের অবস্থা সত্যই মারাত্মক হয়ে পড়ে। অচিরেই তারা জীবন-ধনে বঞ্চিত হয়ে দীন হয়ে পড়ে। তাদের না থাকে সৌন্দর্যবোধ, না থাকে আনন্দ গ্রহণের ক্ষমতা। তাদের জীবন হয়ে পড়ে ফাঁকা, আর সেই ফাঁক পূর্ণ করবার জন্য তাদের অর্থ-প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা আরও বেড়ে চলে। ফলে ধন যত বাড়ে, জীবন তত নির্ধন হতে থাকে; সিন্দুক যত ভর্তি হয়, অন্তর তত শূন্য হতে থাকে। এই শূন্য জীবন নিয়ে অর্থ-প্রতিপত্তির জোরে তারা সমাজের নেতা হয়ে দাঁড়ায়, আর নিজের শূন্যতা তথা কদর্যতা (কেননা, বাগান খালি থাকে না, ফুলগাছ না থাকলে কাঁটাগাছ থাকে) সমাজদেহে সংক্রেমিত করে সমাজের অশেষ ক্ষতি করে।

শ্রেষ্ঠতার আরাধনাই মানুষের কর্তব্য, নিকৃষ্টতার পূজা নয়। আর শ্রেষ্ঠতার আরাধনার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় প্রকৃত অনুরাগ। অনুরাগই কঠিন ব্যাপারকে সহজ করে তোলে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহকে ভালোবাসলেই নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের দাবি কমে আসে, নইলে তাদের জুলুমের অন্ত থাকে না। বড়কিছুকে ভালো না বাসলে ছোটকিছুর অত্যাচারে জীবন জীর্ণ হয়ে আসে, ভালোবাসাকে বড় না জানলে ঘৃণা-বিদ্বেষের জয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতি প্রয়োজনের ভাঁওতায় বড় জিনিসকে ছোট, আর ছোট জিনিসকে বড় করে তুলে মানুষের অশেষ অকল্যাণ করে। সৌন্দর্য ও আনন্দের ওপর জোর না দিয়ে টিকে থাকার প্রবৃত্তির ওপর জোর দেয় বলে তা জীবনের কদর্য ক্ষুধাকেই বড় করে তোলে। সুতরাং 'আগে টিকে থাকা পরে সৌন্দর্য' এই নীতির প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো; কেননা, তাতে শালীনতার ও শোভনতার দাবি নিচে পড়ে যায়, আর বর্বর অধিকার-বৃত্তি লেলিহান জিহ্বা মেলে ধেই ধেই নৃত্য করতে থাকে। তাকে সংযত করতে পারে সৌন্দর্য-প্রেম, অন্য

কিছু নয়। নীতির শাসন এখানে ব্যর্থ। যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতি মানুষকে ইতরতা থেকে মুক্ত হতে দেয় না, ছোটখাটো স্বার্থের নিগড়ে বেঁধে রেখে তাকে নীচমনা করে গড়ে তোলে। ছোট ভাব সবসময়ই বড় ভাবকে ব্যর্থ করেছে ও করবে। অতএব, বড় ভাবের প্রতি বিশেষ অনুরাগ না থাকলে তার কোনো ভরসা থাকে না। সত্যের জয় হবেই এ-কথা ভুল; জয় হোক না হোক, সত্যের জন্য প্রাণপাত করা উচিত, এ-কথাই ঠিক। মিথ্যা আশায় সত্যের জয় কমে আসে—পরাজয়ের লক্ষণ দেখলে মন দ্বিধান্বিত হয়।

দর্শন সম্বন্ধে ওপরে যা বলা হয়েছে তার আর-একটি নজির সম্প্রতি আমার চোখে পড়েছে। দার্শনিক যখন বলেন, মানুষের বিকাশের পশ্চাতে অর্থনীতিই প্রধান, তখন তিনি সাধারণ সত্যই প্রচার করেন; কিন্তু দর্শনের সমর্থনে এই সাধারণ সত্যই মহামূল্য হয়ে দেখা দেয় এবং একে অতিক্রম করার শক্তি-যে ব্যক্তিমানুষের আছে, মানুষ তা ভুলে যায়। ফলে মানুষের ইচ্ছাশক্তি সঙ্কুচিত হয়ে আসে—মানুষ মহৎ ও সুন্দর জীবনের দায়িত্ব অস্বীকারের পথ খুঁজে পায় এবং অপরের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যকে ছোট করে দেবার সুযোগ লাভ করে। এতে তার ক্ষতি হয় বিস্তর—বাস্তব-উত্তীর্ণ হওয়ার আত্মিক শক্তি থেকে বঞ্চিত হয় বলে তার স্বাধীনসত্তা কিছুই থাকে না, সে অবস্থার দাসমাত্র হয়ে পড়ে। একপ্রকারের নিরুদ্বেগ জীবন সে লাভ করে বটে, কিন্তু এই নিরুদ্বেগতা নিষ্প্রাণতার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। মনের কান্না তার থেমে যায়, আর এই মনের কান্নাই-যে মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা, তা সে উপলব্ধি করতে পারে না। অথবা মনের কান্নাও থামে না, তার উদ্দেশ্যই শুধু পরিবর্তিত হয়—অর্থ সৌন্দর্য ও আনন্দের স্থান দখল করে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে কী একটা শক্তির অপমৃত্যু ঘটে। এই শক্তি আর কিছুই নয়, সৌন্দর্য ও আনন্দের ক্ষুধা। এর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক শক্তি রহিত হয়ে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়।

সৃষ্টির গোড়ায় বুভুক্ষা বা বেদনা। বেদনার ফলেই অসম্ভব সম্ভব হয়। দার্শনিকের শিক্ষার ফলে কী করে এই বেদনার মৃত্যু হয়; ইদানীং তার একটি প্রমাণ পেয়েছি। আমার তরুণ বয়সে জনৈক কিশোর-বয়স্ক ছাত্রকে আমার খুব ভালো লাগত। তিনি মাঝে মাঝে মুসলমানসমাজের মানসিক দীনতা সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করতেন, আর যাঁরা সেকালে এই দৈন্য দূর করার আন্তরিক চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের প্রশংসা করতেন। তাঁর মুখে কবি-সাহিত্যিকদের কথাই ছিল, রাজনীতিকদের কথা নয়। তিনি বলতেন, রাজনীতিকরা অধিকার আদায় করেন বটে, কিন্তু সুন্দর ও আনন্দিত জীবনের প্রেরণা দেন কবি-সাহিত্যিকরা; তাই তাঁরা সমাজের প্রকৃত স্রষ্টা, মানুষের অন্তরে তাঁদেরই সিংহাসন। তবে মাঝে মাঝে যে রাজনীতিকরা বড় হয়ে ওঠেন, তার কারণ সমাজের রুগ্ণ অবস্থা; পীড়িতের কাছে ডাক্তারই বড়, বন্ধু নয়। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় এর বিপরীতটাই ঠিক। আধুনিককালে যে রাজনীতিকরা পৃথিবীতে বড় স্থান লাভ করেছেন, তার কারণ পৃথিবীর পীড়িত অবস্থা। এক হিসাবে দেখতে গেলে সমাজের অভ্যন্তরীণ বিকাশের বাহ্যিক প্রকাশ বলে রাজনৈতিক আন্দোলন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার—সমাজ যে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ নয়, তারই লক্ষণ। কিন্তু বন্ধুদের ছেড়ে যে রোগী ডাক্তারকেই বড় করে তোলেন, বুঝতে হবে তিনি চিররোগী। তাঁর মুক্তির উপায় স্বল্পই। চিররোগ প্রায়ই মানসিক ব্যাধি। অতএব, বন্ধুবান্ধবের প্রীতিকর সঙ্গই তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়—বোতল বোতল ঔষধ সেবনে

ফায়দা পাওয়া কঠিন। যে জাতি বা সমাজ কবি–সাহিত্যিক ও সৌন্দর্যশিল্পীদের অবজ্ঞা করে কেবল রাজনীতিকদের বড় করে দেখে, চিররোগীর ন্যায় তারও মুক্তি সুদূরপরাহত।*

রাজনীতিজ্ঞের প্রিয় হওয়ার একটি কারণ, মানুষের ঝগড়াটে মনোবৃত্তি। মানুষ স্বভাবতই কোন্দলপ্রিয়; রাজনীতি কোন্দলপ্রিয়তার খোরাক যোগায়। ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা সমাজ সহ্য করে না, চোখ রাঙিয়ে তা দমাতে চায়; কিন্তু বিজাতির প্রতি ঈর্ষায় সমাজের বাহবা পাওয়া। ব্যক্তির প্রতি গালাগালি পাপ, বর্বরতা; কিন্তু বিজাতির নিন্দা পরম শ্লাঘার ব্যাপার। রাজনীতি এই ঈর্ষা ও নিন্দার পথ খোলাসা করে দেয় বলে মানুষের জীবনে তার এত প্রভাব। মানুষ মনুষ্যত্বের বড়াই করে বটে, কিন্তু আসলে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেই বেঁচে যায়। যুদ্ধের উন্মাদনা এই মুক্তির সুযোগ হয়ে দেখা দেয়; তাই যুদ্ধের নামে ছেলে–বুড়ো সকলেরই উল্লাস। রাজনীতিও একপ্রকারের যুদ্ধ—স্নায়ুর সংগ্রাম। তাই মানুষের কাছে যুদ্ধের মতো রাজনীতিরও আদর। সাধারণ অবস্থায় মানুষের গায়ে কাদা কি থুতু দেওয়া যায় না । কিন্তু প্রবল রাজনীতির যুগে তা সহজেই করা যায়। রাজনীতির যুগে অসুবিধা হয় শুধু চিন্তাশীলদের। মোটা সুরের সঙ্গে মিহি সুর মেলাতে পারেন না বলে তাঁদের অস্বস্তির অন্ত থাকে না। লম্বা লোকেরা হাঁটু ও কোমর ভেঙে বেঁটে হওয়ার চেষ্টা করে শুধু দুঃখই পান। রাজনীতির অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করার একমাত্র উপায় রাজনীতিকে জীবনের সারবস্তু মনে না করে মাত্র বেঁচে থাকার উপায় বলে মনে করা। তা হলেও শাশ্বত নীতির চরণে মাথা ঠেকিয়ে তা সুন্দর ও সংযত হতে পারবে। নতুবা তার কদর্যতার অন্ত থাকবে না। সংসার–ধর্ম সকলেরই পালন করতে হয় এবং করা উচিত; কিন্তু একটা উঁচু লক্ষ্যের দিকে নজর না রাখলে সংসার হয়ে পড়ে একটা কারাগার—বদ্ধকূপের জলের মতো তা মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

কিশোর–বন্ধুটির কথার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। তিনি সত্যকথাই বলতেন, কবি–সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাঁরাই জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বাঁচিয়ে রাখেন। গৃহনির্মাণে গৃহস্বামীর যে–স্থান, রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারেও কবি–সাহিত্যিকদের সেই স্থান! গৃহস্বামীর ইচ্ছা, অভিরুচি, খেয়াল ও কল্পনার খোঁজ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার গৃহের প্লান বা পরিকল্পনা তৈরি করেন; পরে ওভারশিয়ার, রাজমিস্ত্রি ও যোগালির সহায়তায় গৃহনির্মাণ কার্য সমাধা করেন। রাষ্ট্রও এভাবেই গঠিত হয়। রাষ্ট্রে বাস করে 'জীবন'। জীবন মূক; তার প্রতিনিধি কবি ও সাহিত্যিক—জীবনের ভালোলাগা, মন্দলাগা, আশা–আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র সাধ ও গভীর অভীপ্সা এঁদের মারফতেই অভিব্যক্ত হয়। রাজনৈতিক চিন্তাবীররা এঁদের জীবনবোধের সহায়তা নিয়ে আদর্শ–রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন। তার পরে আসেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ; ছোট–বড় কর্মীদের সহযোগিতায় তাঁরা গড়ে তোলেন জীবনের আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রসৌধ। কবি–সাহিত্যিকের জীবনবোধের দিকে না–তাকালে তা হয়ে পড়ে শ্রী–মাধুর্যহীন কাজ–চলা গোছের ইমারত। তাতে সাধারণ জীবন তথা ব্যবসায়–বাণিজ্য চলে ভালোই, কিন্তু সুন্দর জীবনযাপন হয়ে পড়ে অচল।

---

* রুগ্ণ অবস্থায় মানুষের কুপথ্যে রুচি হয় ; প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগেও কুপ্রবৃত্তি বড় হয়ে ওঠে। তাই সামাজিক সমর্থন লাভ করে নিষ্ঠুরতাকে নগ্নমূর্তিতে রাজপথে বের হতে দেখা যায়।

এ-সম্বন্ধে আরেকটি কথা মনে রাখা ভালো। সৌন্দর্যের সাধনা পূর্ণাঙ্গ চেহারার সাধনা, শুধু শিরদাঁড়ার সাধনা নয়। তাই চেহারা সম্বন্ধে আমরা যতটা সচেতন, মেরুদণ্ড সম্বন্ধে ততখানি নই। আমাদের খাওয়া-পরা বিলাস-ব্যসন সমস্ত কিছু এই চেহারার সৌন্দর্যের জন্যই। অবশ্য খাওয়াদাওয়ার ফলে শিরদাঁড়াও শক্ত হয়। কিন্তু সেদিকে আমরা সজাগ নই, আমাদের সচেতনতা কেবল চেহারা নিয়ে। আর চেহারার সৌন্দর্য কেবল খাওয়া-পরার উপর নির্ভর করে না, সেজন্য ভাবসাধনারও প্রয়োজন। এমনকি সৌন্দর্যসাধনার ব্যাপারে খাওয়া-পরার চেয়ে ভাবসাধনার দানই বেশি; আর এই ভাবসাধনার প্রবণতা মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দেয়ার দিকে যতখানি, সিধা রাখবার দিকে ততখানি নয়। তথাপি সাধনাকেই আমরা ভালোবাসি। বিশ্রী চেহারার দৃঢ়মেরুদণ্ড মানুষের চেয়ে সুন্দর চেহারার দুর্বলমেরুদণ্ড মানুষই আমাদের প্রিয়—ক্ষীণকায় শিল্পবীরের সঙ্গেই আমরা হাত মেলাতে চাই, বিপুলকায় মল্লবীরের সঙ্গে নয়। এখানেই মানুষের মনুষ্যত্বের জয়, কেননা এখানেই সে তার আত্মার মূল্য দেয়।

ব্যক্তির জীবনে শিরদাঁড়ার যে-স্থান, জাতির জীবনে রাজনীতির সেই স্থান। শিরদাঁড়া ছাড়া ব্যক্তি চলতে পারে না। আর রাজনীতি ছাড়া জাতি অচল। তথাপি মাত্রাজ্ঞানহীন মেরুদণ্ডের সাধনা যেমন ব্যক্তির পক্ষে মারাত্মক, মাত্রাজ্ঞানহীন রাজনীতির সাধনাও তেমনি জাতির পক্ষে অশুভকর। কেননা, উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে আত্মা বিকৃত হয়ে যায়। জাতি যদি কেবল রাজনীতির সাধনা করে তো তার মেরুদণ্ড ষাঁড়ের মতো শক্ত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারাটিও ষাঁড়ের মতোই কদর্য হয়ে ওঠে। রাজনীতিসর্বস্ব ষণ্ডামার্কা জাতিরা মৌতাতের জন্য মানুষের মতো কোলাকুলি বা করকম্পন না করে ষাঁড়ের মতো গুঁতোগুঁতি করে। ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা লণ্ডভণ্ড হয়ে পৃথিবীর সর্বনাশ হয়—মানুষের জীবনে মূল্যবান বলে আর কিছু থাকে না। প্রতিকারস্বরূপ মনে রাখা দরকার, মেরুদণ্ড বাঁচার লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র; রাজনীতিও জাতির লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ—লক্ষ্য সৌন্দর্যধ্যান ও আনন্দসাধনা। লক্ষ্যের স্থান উপলক্ষ তথা দেবতার স্থানে বাহনকে বসিয়ে পূজা করলে কালের হাতে শাস্তি পেতে হয়, আর যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভেতর দিয়ে আমরা সেই শাস্তিই পেতে থাকি।

ওপরের যে-বন্ধুটির কথা বলা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হয় কিছুদিন আগে। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—ল ও অর্থনীতিতে এম. এ. পড়ছেন। দেখলুম, তাঁর চেহারার পরিবর্তন হয়েছে—আত্মতুষ্টি আর স্ফূর্তি বেদনার স্থান নিয়েছে। তবু সমব্যথী পেয়েছি ভেবে আমার স্বভাব অনুযায়ী তাঁকে সমাজের মানসিক দৈন্যের কথা বললুম—সমাজ-যে প্রগতিশীল হওয়ার পরিবর্তে দিনদিন পিছিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে ঝাঁঝালো সুরে ইঙ্গিত করলুম; কিন্তু তাতে তাঁর পূর্বপরিচিত সংবেদনশীল চিত্তের সাড়া পেলুম না। বরং আমার কথায় একটুখানি হেসে নিশ্চিন্তে সিগারেট টানতে টানতে ও পান চিবুতে চিবুতে বললেন : সমাজের দোষ কী? এখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজ যে-স্তরে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে তার কাছে এর বাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। অর্থনীতিই তো জীবনের ভিত্তি; কাজেই আফসোস করে লাভ নেই।

আমি নৈরাশ্যমিশ্রিত সুরে বললুম : কিন্তু সেই অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা হচ্ছে কি? কতিপয়ের বড় হওয়ার দিকেই তো সমাজের দৃষ্টি, সাধারণের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার দিকে নয়।

তিনি আশ্বাসের সুরে বললেন : হ্যাঁ হচ্ছে বৈকি? এই-যে লোকেরা চাকরি পাচ্ছে, এতেই সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি : কিন্তু খুব আশানুরূপ এগিয়ে যাচ্ছে কি?—অন্তত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে?

তিনি : হ্যাঁ, যাচ্ছেই তো। হিন্দুসমাজ কি আর একদিনে এতদূর এগিয়ে এসেছে? আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে। আমরাও আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব। রোম নগরী একদিনে নির্মিত হয়নি, মনে রাখবেন।

আমি আর কিছু না বলে সিগারেটটি জ্বেলে ধীরে ধীরে টানতে লাগলুম, আর মনে মনে ভাবলুম : লোকটা ভাগ্যবান, লেখাপড়ার ফলে বেদনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আমি বদনসিব, আমার আর মুক্তি হল না। বেদনা থেকে মুক্তি আর আত্মিক মৃত্যু এক নয় কি? সহজ নিশ্চিন্ত জীবনের মূল্য কতটুকু? অসম্ভবের ক্ষুধা না থাকলে জীবনে আর থাকে কী? বন্ধুর মসৃণ জীবনের ক্রমবিকাশটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল : এম-এ ডিগ্রী, বিসিএস পরীক্ষা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এমএলএ অথবা মন্ত্রীকন্যা, এসডিও, ম্যাজিস্ট্রেট, তার পরে সকলের যা হয় তাই। সেই শেষ অনিবার্য পরিণতি, আর বিস্মৃতি। মানে 'তরক্‌কি' যাকে বলে, তার সবটাই তিনি করবেন, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি কতটুকু করবেন, তা বুঝতে পারলুম না।

মানুষ সব জায়গাতেই অর্থনীতির হাতে বন্দী, শুধু এই সৌন্দর্য ও আনন্দের ব্যাপারেই সে মুক্ত। এর জন্য প্রয়োজনীয় কেবল প্রকৃত ক্ষুধা, আর কিছু হলে ভালো, না হলেও চলে। একবার যার অন্তরে এই ক্ষুধা জেগেছে, সে-ই তার স্বাধীনতা উপলব্ধি করেছে—এক অবস্তুনির্ভর আলোকে তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যাঁরা দুদিক সামলাতে চান—শ্যাম ও কূল—উভয় দিক রক্ষা করতে চেষ্টা করেন, বুঝতে হবে, তাঁদের জীবনে সত্যিকারের ক্ষুধার অভাব—সৌন্দর্যের ডাকে তাঁদের আত্মা উতলা হয়নি। এই ক্ষুধা, জাদুমন্ত্রের মতো এ এক অদ্ভুত জিনিস। যে অনুভব করলে, সে বেঁচে গেল; আর যে অনুভব করতে পারলে না, সে হতভাগ্য, এক অনির্বচনীয় আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত থাকতে হল। তার কাছে তাই বড় হয়ে ওঠে অর্থ আর আচার পূজা—নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার সবচেয়ে বড় উপায়।

ওপরের দার্শনিক মতবাদ সৌন্দর্য ও আনন্দের ব্যাপারে ক্ষুধামান্দ্য ঘটিয়ে নিশ্চেষ্টতার প্রশ্রয় দেয় বলে তাকে সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। মানুষ অবস্থার দাস নয়, প্রভু—এটাই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় আশ্বাসের কথা। সাধারণভাবে মানুষের দৈন্য-দুর্দশা দূর করার চেষ্টা ভালো। কিন্তু অর্থ না হলে সৌন্দর্য ও আনন্দচর্চা চলতে পারে না এবং তা ধনেরই একটা By-product -এর মতো মারাত্মক ধারণা আর নেই।

সৌন্দর্যের কথা মনে রাখলে খাওয়া-পরার কথা আপনাআপনি এসে পড়ে, কিন্তু খাওয়া-পরার কথা মনে রাখলে সৌন্দর্যের কথা মনে না-ও আসতে পারে। আর সৌন্দর্যপ্রেমই খাওয়া-পরার ব্যাপারে সংযম ও শালীনতা এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। শুধু নিজের তৃপ্তির দিকে নজর রাখলে চলবে না, সকলেরই তৃপ্ত হওয়া দরকার—একমাত্র সৌন্দর্যপ্রেমই তা আমাদের শেখাতে পারে। কেননা, প্রকৃত সৌন্দর্যপ্রেমিকের কাছে মানুষের হাসিমুখের মূল্য অনেক।

মনুষ্যত্ব

মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা—জীব-সত্তা আর মানব-সত্তা। জীব-সত্তার কাজ প্রাণধারণ—আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। এখানে মানুষ বৈশিষ্ট্যহীন, প্রাণীজগতেরই একজন—অপরাপর প্রাণীদের মতো ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে ছোটাছুটি করা তার কাজ। কী করে বাঁচা যায় ও সন্তানসন্ততিদের বাঁচিয়ে রাখা যায়, সেই চিন্তায় সে অস্থির। কিন্তু প্রাণী হলেও মানুষ অপরাপর প্রাণীদের পশ্চাতে ফেলে এসেছে এবং নিজের মধ্যে অনুভব করেছে এক নতুন সত্তা। এই নব-অনুভূত সত্তার নামই মানব-সত্তা, আর এখানেই মানুষ অপরাপর প্রাণী থেকে আলাদা। আত্মরক্ষা কি বংশরক্ষা নয়, মুক্তির আনন্দ উপভোগই এখানে বড় হয়ে ওঠে। মুক্তি মানে অস্তিত্বের চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি; শুধু তাই নয়, এক নব সূক্ষ্ম অস্তিত্বের উপলব্ধি। ব্যাপারটা আসলে ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক। সাহিত্যশিল্পের মারফতেই এই মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করা যায়, তাই তাদের এত মূল্য।

প্রাণধারণের জন্য সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি, তা যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, মনুষ্যত্ব নয়, প্রাণিত্ব; আর অবসর সময়ে সাহিত্যশিল্পের রস-আস্বাদান, তা যতই অপ্রয়োজনীয় হোক না কেন, মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব রসের ব্যাপার, তাই রসিকরাই বেশি মানুষ। জাতিধর্ম ও আদর্শ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে পারেন বলে রসিকরাই মনুষ্যত্বকে সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেন—কোনো বাধাই তাঁদের উপলব্ধির পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে পারে না। (এখানেই মতবাদীর সঙ্গে রসিকের পার্থক্য; মতবাদী যতই মানুষের উপকারের জন্য চিৎকার করুক-না কেন, কখনো মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না—মতবাদের নেশাই তার উপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর রসিক যত অকাজেরই হোক না কেন, মনুষ্যত্বের পূর্ণ উপলব্ধির সৌভাগ্য তারই।) অপ্রয়োজনের জগৎই মনুষ্যত্বের জগৎ; এখানেই মানুষ আত্মার লাবণ্য উপভোগ করে। প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দ না হলেও প্রাণধারণের ক্ষতি হয় না; বাঁচার জন্য এরা একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু মানুষের মতো বাঁচতে হলে এসব না হলে চলে না। তাই একান্ত প্রয়োজনীয় না হলেও প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। এসব নিয়ে মানুষ বাঁচে না, কিন্তু এসবের জন্য বাঁচে।

সাহিত্য ও শিল্পের জগৎ প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দের জগৎ। তাই এখানে অস্তিত্ব তথা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা বড় হয়ে ওঠে না, প্রেম ও সহানুভূতির কথা বড় হয়ে ওঠে। প্রেম ও সহানুভূতি আত্মার ইন্দ্রিয়, আর এই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়ই মানুষ মানব-সত্তাকে উপলব্ধি করে।

মনুষ্যত্ব তথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ দিক হলেও প্রাণিত্বকে অবহেলা করা

যায় না; বরং মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়েও চলা যায়, কিন্তু প্রাণিত্বকে বাদ দিয়ে চলা কঠিন। তাই মানুষকে প্রাণিত্বের সাধনাই করতে হচ্ছে বেশি। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি প্রাণিত্বের সাধনারই নিদর্শন, আর তারই ফলে মানুষের জীবনধারণ আর আদিম জৈব ব্যাপার না-থেকে ধীরে ধীরে মানবিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। 'মানবিক' হওয়ার অর্থ জৈব ব্যাপারটাই মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া নয়, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া—মানবোচিত হওয়া।

মানুষ তার বুদ্ধি ও কল্পনার সহায়তায় জৈব ব্যাপারটি সুনিয়ন্ত্রিত করতে চাচ্ছে; সেজন্য পৃথিবীজুড়ে বিরাট আয়োজন চলেছে। খুব আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু লক্ষ্যের দিকে নজর না রাখলে শেষপর্যন্ত সমস্ত চেষ্টাই ভণ্ডুল হতে বাধ্য। লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি—আত্মার লাবণ্য উপভোগ। শারীরিক চিন্তা থেকে মুক্তি চাই আত্মার জগতে প্রবেশের জন্য, এ-কথা মনে না রাখলে জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না।

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব-সত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানব-সত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীব-সত্তার ঘর থেকে মানব-সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানব-সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীব-সত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী ক'রে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

শিক্ষার এই দিকটা যে বড় হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নিচের তলায় বিশৃঙ্খলা। জীব-সত্তার ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়—উপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দী। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে: চাই, চাই, আরো চাই। তাই অন্নচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়—এ-কথা মানুষকে ভালো ক'রে বুঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে-সেখানে দু-একটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশিরভাগ লোকই যে-তিমিরে সে-তিমিরে থেকে যাবে।

তাই অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে সে চেষ্টাও মানুষকে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহার-তৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো-হাওয়ার স্বাদ-বঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে গান ধরবে :

আগর ফেরদৌস বরোয়ে জমিন আস্ত
হামিন আস্ত, হামিন আস্ত, হামিন আস্ত।
(স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ধরণীর 'পরে
তবে তা এখানে, এখানে, এখানে।)

কিন্তু তাই বলে যে তা সত্য সত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো-হাওয়ার স্বাদ-পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে, এবং কী ক'রে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা-ই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে যে-পক্ষী আকুল, সে কি খাঁচায় বন্দী হবে সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মুনষ্যত্বের পরিচয়। চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই, সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড় লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্নবস্ত্রের সমাধান করা ভালো, নইলে তা আমাদের বেশিদূর নিয়ে যাবে না।

তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এই উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বড় করে তুললে সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার উপর নির্ভর করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না-পেলে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকতে পারে; আবার শিক্ষাদীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোনো ভারী জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয়; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে উঠানো যায় না। মানবউন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায়—কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশিদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষাদীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজেই হতে পারে; কেননা অন্নবস্ত্রের অব্যবস্থার মূলে লোভ, আর শিক্ষাদীক্ষার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা বুলিমাত্র নয়, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে—অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে; শিক্ষা মানুষকে সে-কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যা-ই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসাবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবানের মূল্য দেওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে

মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো; কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয় বলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজনীয়। পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দুদিক থেকেই কাজ চলা দরকার। একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ী উন্মোচন, অপরদিক মনুষ্যত্বের আহ্বান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়ীমুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে—পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে কিন্তু উড়তে পারবে না।

আত্মার জগতের স্বাদ পাওয়া যায় সাহিত্যে, শিল্পে। তাই সাহিত্যশিল্পের সহায়তায়ই মানুষের মনের উন্নয়ন সম্ভব হয়। গল্প-উপন্যাস ও কবিতা পড়তে পড়তে কী করে যে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম হয় মানুষ নিজেই তা টের পায় না। এখন থেকে সে রূপ ও রসলোকের অধিবাসী এবং সেখান থেকে সমস্ত জীবন রাজার মতো শাসন করা তার কাজ। এতদিন তার চালক ছিল ইন্দ্রিয়, এখন চালক হচ্ছে রূপবোধ, রসবোধ—অন্য কথায় মূল্যবোধ। নতুন রাজার শাসন মানতে-মানতে ইন্দ্রিয়গুলিও যে রূপান্তর লাভ করে! এতদিন তারা ছিল একক, এখন তাদের আরেকটি সঙ্গী এসে জুটেছে। এতদিন তারা তাদের আহার্য পেলেই খুশি হত, এখন থেকে সহজে খুশি হয়ে ওঠা ভার হয়ে উঠল। সঙ্গীর সত্তাটি যেন অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলতে থাকে : ভাই তোমরা তো খেলে, আমি তো উপোসী রইলুম, কই আমার দিকে একবার ফিরেও তো তাকালে না। সঙ্গীটির কথায় তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, তাকে উপোসী রেখে তাদের মুখে আর অন্ন রোচে না, ফলে অনেক সময় তাদেরও উপোসী থাকতে হয়। তারা কী করে যেন টের পায় : ভোগের চেয়ে সম্ভোগ বড়, আর একসঙ্গে ইন্দ্রিয় ও আত্মার যে ভোগ তা-ই সম্ভোগ। তাই আত্মাকে বাদ দিয়ে তারা কিছুই ভোগ করতে চায় না। আত্মার সংস্পর্শে এসে তাদের উন্নয়ন হয়, প্রেম ও সৌন্দর্য ব্যতীত ভোগ-যে একটা ইতর ব্যাপার, তা তারা উপলব্ধি করতে পারে।

যে-সাহিত্য ও শিল্পের দৌলতে মানুষের এহেন উন্নয়ন, সে-সাহিত্যশিল্পকে প্রচারধর্মী করা হলে তাদের অবনতি ঘটে, আর সাহিত্যশিল্পের অবনতিতে পরিণামে মানুষেরই ক্ষতি। সাহিত্যশিল্পের কাজ সৌন্দর্য ও আনন্দ পরিবেশন, এবং তারই মারফতে ধীরে ধীরে মূল্যবোধ-সৃষ্টি। তাই সাহিত্য ও শিল্প যদি অন্নবস্ত্রের সমাধান না করতে পারে, অথবা অন্নবস্ত্রের অভাবের কথা প্রচার করতে ত্রুটি করে তো তাকে ব্যর্থ বলে নিন্দিত করা অন্যায়। সৌন্দর্য ও আনন্দ পরিবেশনের অক্ষমতাতেই তার ব্যর্থতা, অন্য কোনোরূপ ব্যর্থতা ধর্তব্য নয়। সাহিত্যের একটি নিজের জগৎ আছে; সেই জগতের কাজ করে সে যদি অন্য জগতের কাজ করতে পারে তো তাতে কারো আপত্তি হতে পারে না, কিন্তু নিজের জগতের কাজটি ষোলো-আনা করা চাই।

সাহিত্যিক আর শিল্পী আসলে প্রেমিক; তারা ভালোবেসেছে এই রূপরসগন্ধস্পর্শময়ী ধরণীকে। প্রেমিক সুদিনে প্রিয়াকে খুশি করতে চায় গান গেয়ে, ছবি এঁকে; কিন্তু দুর্দিনে মাঝে

মাঝে তাকে প্রিয়ার নাড়ি টিপেও দেখতে হয়। এটা তার পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। তেমনি কালের গরজে যদি সাহিত্যিক ও শিল্পীকে social engineer কি ভিষক হতেই হয়, তথাপি তাদের মনে রাখা দরকার, সেটা তাদের আসল কাজ নয়, আসল কাজ সৌন্দর্য ও আনন্দ পরিবেশন। দুর্ভাগ্যকে যেন তারা সৌভাগ্য মনে না করে। প্রয়োজনের তাগিদে আসল উদ্দেশ্যটি ভুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক; তাই লক্ষ্যটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকা দরকার। অস্তিত্বের স্থূলচিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে অনুভূতি ও কল্পনার সূক্ষ্ম জগতে নিয়ে যাওয়াই কাজ; তাই উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয় বলে যে-রচনার অস্তিত্বের চিন্তা বড় হয়ে ওঠে সে-রচনা—তাতে যতই মস্তিষ্কের ঘি ঢালা হোক না কেন—উঁচুশ্রেণীর রচনা হতে পারে না। ঘড়া ঘড়া ঘি ঢাললেও শাক শাকই থেকে যায়, পোলাও হয় না। যে-রচনা জীবনের অমৃতত্ব সম্বন্ধে সচেতন না করে মানুষকে ইতরজীবনের নাগপাশে বন্দি করে রাখে, তাকে কিছুতেই সার্থক রচনা বলা যায় না।

সাহিত্য ও শিল্পের ফলে মানুষের এহেন উন্নয়ন হয়, এ-কথা ঠিক কিন্তু শরীর-চিন্তা থেকে মুক্তি না-পেলে সহজে সাহিত্যশিল্পের জগতে প্রবেশ করা যায় না। তাই নিচের তলার ঘরটি ভালো করে গুছিয়ে নেওয়া দরকার। মানুষের চেহারার দিকে তাকালেই মনে হয়, কী একটা অসামঞ্জস্যের পীড়ায় যেন তার জীবন দ্বিধান্বিত—জীবনের অটুটভাব সে হারিয়ে বসেছে; অখণ্ডতার আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। সে যেন চেহারা দিয়েই গাইতে থাকে :

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুই তারে,
জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে।

অনেকে সমস্যাটির সমাধান করতে চান সরু তারটি ছিঁড়ে দিয়ে। কিন্তু সেটি সার্থক সমাধান নয়; মোটা তারটিকে সরু তারটির উপযুক্ত করে তোলাই সার্থক সমাধান। সমাজব্যবস্থাকে এমন সুশৃঙ্খল করা দরকার যেন তা সুকুমারজীবনের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। তাহলেই আমরা উপলব্ধি করব, 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-নীতি অতীতকালের মন্ত্র, আর পেছনে ফেলে আসা প্রাণীযুগের মন্ত্র আওড়িয়ে লাভ নেই, লাভ ভবিষ্যৎ জীবনের মন্ত্র আওড়িয়ে; আর তা হচ্ছে : Expression of the beautiful—সুন্দরের বিকাশ। সম্মুখের মন্ত্র আমাদের সম্মুখে টেনে নিক, অতীতের মন্ত্র অতীত হয়ে যাক।

প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দই মানুষের মধ্যে মূল্যবান, তাই এদের জয় মনুষ্যত্বেরই জয়, আর এদের সঙ্গে যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতির বৈরীভাব সুবিদিত। জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বাদ পেতে হলে এই সর্বনাশা নীতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া চাই; নইলে তা মাধ্যাকর্ষণের মতোই আমাদের ইতর জীবনে আবদ্ধ করে রাখবে, ওপরে উঠতে দেবে না। Expression of the beautiful-এর মন্ত্র ঊর্ধ্বকর্ষণের মন্ত্র—তা পঙ্কিল জীবন থেকে ঊর্ধ্বে টেনে নিয়ে আমাদের আত্মিক ক্রমবিকাশে সহায়তা করবে। তারই টানে বর্বরতামুক্ত হয়ে আমরা সুসভ্য হয়ে উঠব। আর সুসভ্যতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য।

সুসভ্যতার জন্য কল্যাণসৃষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলে কল্যাণই সুসভ্যতা নয়; তা সুসভ্যতার পাদপীঠ মাত্র। কল্যাণ প্রাণী-সত্তারই ব্যাপার, আর রূপ-রস মানব-সত্তার।

তাই রূপ ও রসের দিকে দৃষ্টি না-রেখে কল্যাণ-সৃষ্টির সাধনা করলে শেষপর্যন্ত তা অন্ধগলি হয়ে দাঁড়ায়। রূপ ও রসের সাধনাই মনুষ্যত্ব তথা সভ্যতার সাধনা। কল্যাণের সাধনা তার সহায়ক, তার বেশিকিছু নয়, এ-কথা মনে না রাখলে অনেক সময় ঘোড়ার আগে গাড়ি সাজানোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

রূপলোক ও রসলোকে আমাদের উন্নত করতে পারে শিক্ষা। তাই শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য, এবং সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য মনের চোখ ও রসনা সৃষ্টি করা। যেখানে তা হয়নি সেখানে শিক্ষা ব্যর্থ। মনুষ্যত্বের সাধনা জীবনে লঘুভার হওয়ার সাধনা, আর প্রেম-সৌন্দর্য ও আনন্দের তাগিদেই আমরা লঘুভার হতে পারি। শিক্ষা আমাদের এই প্রেম-সৌন্দর্য ও আনন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের সাধনায় তথা জীবনে লঘুভার হওয়ার সাধনায় সহায়তা করে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর রূপ ও রসের জন্য কল্যাণ, কল্যাণের জন্য রূপ ও রস নয়—এই বোধ থাকে না বলে শিল্প-সাহিত্যের এত অপব্যবহার ঘটে। শিক্ষার কাজ সেই মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

প্রাণীমানুষটির চেয়েও-যে একটা বড়মানুষ আমাদের জীবনে রয়েছে, তাকে না জানলে মনুষ্যত্বকে জানা হয় না। শিক্ষা আমাদের এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন রাখে, কিন্তু তাই বলে যে তা আমাদের একেবারে আলাদা করে রাখে, তা নয়। শিক্ষার ফলে আমরা জানি : রস ও সৌন্দর্যের দরুন আমরা প্রকৃত-জগৎ তথা তরুলতা ও প্রাণীজগৎ থেকে আলাদা, আবার রস সৌন্দর্যের তাগিদে তার সঙ্গে বাঁধা, কেননা প্রকৃতি-জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা উপলব্ধি করতে না পারলে সৌন্দর্য ও আনন্দ লাভ করা যায় না।

জীবনবৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তাই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোনো মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তোলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিত্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আনন্দময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতরজীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতো হালকা মনে করে।

যেখানে কামে-প্রেমে প্রভেদ করা হয় না, সত্যে-সত্যে প্রভেদ অস্বীকৃত থাকে; অর্থাৎ নিম্নস্তরের সত্য ও উঁচুস্তরের সত্য বলে কোনো জিনিস থাকে না, যেখানে মুড়ি-মিছরির একদর, সেখানে সুসভ্যতার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। আর যেখানে এর বিপরীতটি ঘটে সেখানে তা মুক্ত, স্বাধীন অবাধগতি। তার চলার ভঙ্গিতে ঝলমল করে ওঠে মানুষের দেহমন, হালকা হয়ে যায় জীবনের গুরুভার। সত্যের স্তরভেদে সুসভ্যরা বিশ্বাসী; তারা জানে সমাজগঠনের নীতি নিম্নস্তরের সত্য, জীবনগঠনের নীতি উঁচুস্তরের সত্য। এবং সমাজগঠনের নীতিকে যে-মূল্য দেওয়া উচিত তা তারা দেয়, কিন্তু কখনো তাকে জীবনগঠনের নীতির মর্যাদা দেয় না।
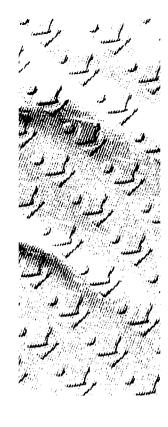
চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি '**চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা**'র
অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।